নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৪ পৃ: ৬৫-১০৩
© ২০০৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

‘গণ হিস্টেরিয়া’র বহুমাত্রিকতা : গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ‘অসুস্থতা’র লিঙ্গীয় স্বরূপের উপাখ্যান

আইনুন নাহার*

১. ভূমিকা

২০০৭ সালের জুলাই থেকে আগস্ট মাস অব্দি বাংলাদেশের ১৬ টি জেলার ২০টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের আকস্মিক অসুস্থতার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় যা ‘গণ হিস্টেরিয়া’ বা, ‘ম্যাস-হিস্টেরিয়া’ শিরোনামে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমগুলোর কল্যাণে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয় যেখানে ‘আক্রান্ত’দের বেশিরভাগই ছিল নারী। উল্লেখ্য যে, নরসিংদীর রায়পুরা থানার অন্তর্গত ‘‘আদিয়াবাদ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ’’ এর ক্ষেত্রে এ ধরনের আকস্মিক ‘অসুস্থতা’র ঘটনাটি সর্বাধিক প্রচারণা পায়। ১৪ জুলাই, ২০০৭ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকহারে আকস্মিক ‘অসুস্থতা’র সংক্রমণ ঘটলে তা সারা দেশব্যাপী আলোচনার সৃষ্টি করে, যদিও বাংলাদেশে এর আগে কখনো যে এমন ‘অসুস্থতা’র ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি বিষয়টি এমন নয়। বরং, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় এমন ঘটনার খবর স্বল্প পরিসরে হলেও লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবেও বিগত দুই দশকের বিভিন্ন সময়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, কুয়েত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে এই ‘অসুস্থতা’র প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে (Bartholomew & Goode 2000; Bartholomew & Wessely 2002; Bartholomew 2005; Verma & Srivastava 2003) । বিভিন্ন দেশে এ ধরনের ‘রোগ/অসুস্থতা’য় সংখ্যার দিক থেকে বেশীরভাগ নারীরা আক্রান্ত হলেও নাইজেরিয়া, ভারতের দিল্লীতে (যেখানে এ ধরনের ‘রোগ/অসুস্থতা’র ঘটনা Monkey Man নামে পরিচিতি লাভ করে) পুরুষদের আক্রান্ত হবার হার বেশী পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নরসিংদী তে ২০০৭ সালে আদিয়াবাদের ঘটনাটির আগেও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালে মেহেরপুরে, ২০০৬ সালে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় এ ধরনের ‘অসুস্থতা’র ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় এগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এসেছিল মূলত ‘অজ্ঞাত রোগ’ হিসেবে। খোদ ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসেই এরকম একটি ‘অসুস্থতা’র ঘটনা ফরিদপুরে ঘটে যা সম্পর্কে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাকেন্দ্র (IEDCR) অবহিত হয় ১৩ এপ্রিল। IEDCR এর অপ্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ‘অসুস্থতা’র খবর স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু, ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ‘অসুস্থতা’র এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিয়াবাদ যতটা

*সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইল : anaher_ju@yahoo.com

ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে (বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে) সেরকমটি এর আগে কখনো হয়নি। এই প্রেক্ষিতে কতগুলো প্রশ্ন যেমন- কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে একটি 'রোগ/অসুস্থতা' এবং একটি এলাকা আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়? নানা স্তরের মানুষজন কিভাবে এই 'রোগ/অসুস্থতা'কে ধারণায়ন করে? এই 'রোগ/অসুস্থতা'য় লিঙ্গীয় মাত্রার প্রকৃতি/ ধরন/স্বরূপটি কেমন? - উত্থাপন করা এবং এ বিষয়গুলোকে অনুসন্ধান করাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। নরসিংদী জেলার আদিয়াবাদ গ্রামে নভেম্বর'২০০৭ থেকে ২০০৮ এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নানা সময়ে মাঠ-গবেষণার' মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ'র সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অপরাপর মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, নানাস্তরের ক্ষমতাসম্পর্ক ও তার চর্চা , নারীর অধস্তনতা এবং নারীর বহুমাত্রিক প্রান্তিকতাকে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ও মতাদর্শিক লিঙ্গীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ, এই পুরো ঘটনাপ্রবাহকে এই সমস্ত বিষয়গুলোর আন্তঃসম্পর্কের জটিল সমগ্রের আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. হিস্টেরিয়া ও'গণ হিস্টেরিয়া': ইতিহাসের পাতা থেকে - নানা দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে 'রোগ/অসুস্থতা' ও এর লিঙ্গীয় স্বরূপ অনুধাবনকল্পে সংক্ষিপ্ত সাহিত্য ও তাত্ত্বিক অধ্যয়ন

আদিয়াবাদে উদ্ভূত 'রোগ/অসুস্থতা'কে এখন 'ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস' বা, 'গণ মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' বলে উল্লেখ করবার কথা বেশীরভাগ চিকিৎসকদের তরফ থেকে প্রস্তাব করা হলেও এই 'রোগ/অসুস্থতা' সারা বিশ্বব্যাপী কয়েকশত বছর ধরে 'ম্যাস-হিস্টেরিয়া' বা,'গণ হিস্টেরিয়া' নামেই চলে এসেছে। ফলশ্রুতিতে,'ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস' অথবা, 'ম্যাস সোশিওজেনিক ইলনেস'– যা কিছুই নামকরণ করা হউক না কেন তা হিস্টেরিয়া / 'গণ হিস্টেরিয়া' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক আলোচনা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়, যা কিনা প্রবন্ধটির এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয়।

Rousseau (1993) 'গণ হিস্টেরিয়া' সংক্রান্ত ধারণাটিকে উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার বলে আখ্যয়িত করলেও, American Family Physician নামক একটি জার্নালে প্রকাশিত লেখা থেকে দেখা যায় যে, মূলত ৬০০ বছরেরও বেশী সময়কাল ধরে নানা সংস্কৃতি ও নানা স্থানে এই প্রকারের 'রোগ/অসুস্থতা'র নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় (Timothy 2000:2649)। আধুনিক জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞনের দৃষ্টিকোণ থেকে 'গণ হিস্টেরিয়া' কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

"ম্যাস হিস্টেরিয়া যাকে কালেক্টিভ/সামষ্টিক হিস্টেরিয়া, ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস/গণ মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা অথবা কালেক্টিভ অবসেশনাল বিহেভিয়ার/ সামষ্টিক আবেশগত আচরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে একই হিস্টেরিক্যাল লক্ষণে একাধিক ব্যক্তির আক্রান্ত হবার সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। ম্যাস হিস্টেরিয়ার একটা সাধারণ অভিব্যক্তি তখনই ঘটে যখন একদল লোক বিশ্বাস করে যে, তারা একই প্রকারের রোগ বা অসুস্থতায় ভুগছে।" (Wikipedia on Mass hysteria)

আজ পর্যন্ত বিশ্বে এ ধরনের যত 'অসুস্থতা'র ঘটনা ঘটেছে- বৃহৎ সংখ্যায় একসাথে অনেকের প্রায় একই ধরনের লক্ষ্মণে আক্রান্ত হওয়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধিকহারে নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া , অল্প সময়ে সেরে ওঠা - সে ধরনের যাবতীয় অসুস্থতাকে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচলিত সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়নি তখন অসুস্থতায় আক্রান্ত জনসাধারণ ব্যতীত অপরাপর জনসাধারণের কাছে এরকম অসুস্থতার ব্যাখ্যায়, নামকরণে চিকিৎসকরা 'গণ হিস্টেরিয়া' নামটি দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার করে আসছেন। অধুনা সময়কালে 'গণ হিস্টেরিয়া'কে 'ম্যাস সোশিও/সাইকোজেনিক ইলনেস' বলা হয় (Bartholomew & Goode 2000; Bartholomew & Wessely 2002; Wikipedia)। Harfer (1985) বলেন যে, ১৯৮৫ সাল নাগাদ এ ধরনের ১৮০টি অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়। ৩০ টিরও বেশী টার্ম এর উল্লেখ এ ধরনের প্রাদুর্ভাব এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যার মধ্যে বহুলশ্রুত কিছু টার্ম হচ্ছে - mass hysteria, mass psychogenic illness, hysterical contagion, epidemic hysteria প্রভৃতি (Harfer in Verma & Srivastava 2003) । 'গণ হিস্টেরিয়া'র লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে মাথাব্যথা, অজ্ঞান বা ফিট হওয়া, তীব্র মাথাব্যথা, খিঁচুনী, বুকে ব্যথা, দম-বন্ধ ভাব, বমিবমি ভাব বা বমি, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রলাপ বকা প্রভৃতি (ICDDR,B 2008) যেগুলো সম্পর্কে আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মেও অসুস্থতায় আক্রান্তদের কাছ থেকে শুনতে পাই। একক ব্যক্তির চিকিৎসা ক্ষেত্রে এসব লক্ষণের বহিঃপ্রকাশকে হিস্টেরিয়া বলে অভিহিত করেন । 'গণ হিস্টেরিয়া' নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে হিস্টেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা তাই নিতান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ভিক্টোরিয়ান আমলে চিকিৎসাশাস্ত্রে হিস্টেরিয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে কয়েকশত বছর ধরে এর নিরূপন এবং চিকিৎসাবিধান ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। প্রাচীন সময়কাল থেকেই হিস্টেরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাব কে সনাক্ত করা যায়। গ্রীসে হিপোক্র্যাটিক কর্পাস এর "গাইনোকোলজিক্যাল ট্রিটিজ" এ এই রোগের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সময়টা ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫ম এবং ৪র্থ শতাব্দী। এমনকি এরও আগে মিশরীয় প্যাপিরাসের উপর লিখিত হস্তলিপিতেও এ রোগ সম্পর্কে বর্ণনা খুঁজে

পাওয়া যায়। "প্লেটোর সংলাপ"- এ টিমেয়াসকে বলতে দেখা যায় যে, একটা জরায়ু একজন নারীর সমগ্র শরীর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পরে এটি ফুসফুসে ঢুকে পড়বার কারণে সেই নারী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই তত্ত্বটিই এই রোগের নামকরণের উৎস যার উৎপত্তি গ্রীকশব্দ Hystera যার সমার্থক হল জরায়ু। ১৮৫৯ সালে একজন চিকিৎসক দাবি করেন যে, সিকিভাগ নারী হিস্টেরিয়াতে ভোগেন। এরকম দাবি করাটা সঙ্গত হয়ে ওঠে এ কারণে যে, একজন চিকিৎসক হিস্টেরিয়ার সম্ভাব্য লক্ষণ হিসেবে ৭৫ পৃষ্ঠার লক্ষণনামা তৈরি করেন এবং তারপরও এই তালিকাকে অসম্পূর্ণ বলে অভিহিত করেন। প্রায় সব ধরনের সামান্য অসুস্থতাই এই ডায়াগনোসিস এর সাথে খাপ খায়। চিকিৎসা বিষয়ক লেখালেখিগুলোতে নিযুক্ত অনেক লেখক দাবি করেন যে, কনভার্সন ডিজঅর্ডার যেমন, হিস্টেরিয়া সম্পর্কে আগের তুলনায় মানুষজনের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে, তারা এ রোগের পিছনকার মনস্তত্ত্বকে বুঝবার জ্ঞান লাভ করেছেন আর সে কারণে এ রোগকে কেন্দ্র করে সমাজ থেকে আর সে রকম কোন সাড়া পাওয়া যায়না। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে এটাও বলা হয় যে, রোগটি আছে বটে তবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে চিকিৎসকের দ্বারা। অর্থাৎ, চিকিৎসক ছাড়া কেউ খালি চোখে রোগটির অস্তিত্ব খুঁজে পান না। হিস্টেরিয়া রোগটির সাথে এতগুলো লক্ষণকে জুড়ে দেয়া আছে যে সেখানে আদতে সব ধরনের অসনাক্ত অসুস্থতাকে এটেঁ দেয়া সম্ভব (Wikipedia on female Hysteria)।

Elaine Showalter সহ অন্যান্যদের সম্পাদিত (1993) "Hysteria Beyond Freud" নামক গ্রন্থে হিস্টেরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নানা সময়ে নানাজনের বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা হিস্টেরিয়ার লিঙ্গীয় রাজনীতি বুঝবার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ ' "A Strange Pathology" Hysteria in the Early Modern World, 1500-1800' এ Rousseau উল্লেখ করেন যে, Leopois (1620) এর পর Sydenham হলেন প্রতিথযশা চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি হিস্টেরিয়া ব্যাখ্যায় "Uterine etiology" (অর্থাৎ, নারীর জরায়ুর সাথে সম্পৃক্ত করে রোগের ব্যাখ্যা) থেকে বের হয়ে এসে রোগটিকে ব্যাখ্যা করেন। Sydenham তার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেন যে, হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ব্যথা-বেদনা অন্য যে কোন সুস্থতায় আক্রান্ত রোগীর চেয়ে দুঃসহ। তিনিই প্রথম বলেন যে, কোন একক অঙ্গ এ রোগের জন্য দায়ী নয়। বরং, মানসিক আবেগ এবং শারীরিক বিকার এর যৌথ সমন্বয়ে এ রোগের সূচনা ঘটে যা ক্রিয়া করে স্নায়ুর মধ্য দিয়ে। এই শেষোক্ত বিষয়টিতে এসে তিনি থেকে দৃঢ়ভাবে Leopois ভিন্নমত পোষণ করেন যেখানে মস্তিষ্ককে হিস্টেরিয়ার উৎসকেন্দ্র বলে ভাবতেন। সংক্ষিপ্তভাবে বললে, Sydenham তিনটি র‍্যাডিকেল উপসংহারে উপনীত হন, দাবি করেনঃ

প্রথমত, নারী এবং পুরুষ উভয়েরই হিস্টেরিয়া হতে পারে; দ্বিতীয়ত, সব রোগের মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ রোগ হল হিস্টেরিয়া; তৃতীয়ত, হিস্টেরিয়া হল সভ্যতার সক্রিয় রূপ অর্থাৎ, যে সব লক্ষণ হিস্টেরিয়ার দিকে ধাবিত করে সেগুলো সংস্কৃতিকে "অনুকরণ" করে উৎপত্তি লাভ করে । তার মতে, হিস্টেরিয়া অন্য সব রোগের অনুকরণ করে। হিস্টেরিয়া একভাবে সভ্যতাকেও অনুকরণ করে (Rousseau 1993:139-145)। এই প্রক্রিয়ায় Sydenham রোগ হিসেবে হিস্টেরিয়াকে কেবল শরীর কিংবা, কেবল মনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখবার মানসিকতা থেকে সরে এসে রোগের সাথে সমাজ সংস্কৃতিকে যুক্ত করে দেখবার প্রয়াস পান। আবার, Porter (1993:242) ও বলেন যে, দেহ এবং মন তাদের নিজেদের মধ্যে কোন স্থবির ক্যাটাগরি নয় বরং, সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সমাজের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়তায় কিভাবে মানুষের দেহ ও মন পরিবেশিত হয় সেটিকে দেখা গুরুত্বপূর্ণ ।

একই গ্রন্থের "Hysteria, Feminism and Gender" নামক প্রবন্ধে Showalter হিস্টেরিয়ার ঐতিহাসিক লিঙ্গীয় নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। হিস্টেরিয়া বিষয়ক আলোচনায় খুব উল্লেখযোগ্য একটি নাম হচ্ছে Charcot যিনি হিস্টেরিয়াকে দেখেছেন শরীরের সাথে জুড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি হিস্টেরিয়াকে বংশগত রোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যদিও তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে সচেতন ছিলেন যে, সাধারণত মানসিক এবং আবেগিক আঘাত থেকেই হিস্টেরিয়া বিকাশ লাভ করে। তিনি মনে করতেন যে, নারী এবং পুরুষ উভয়েই হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। Charcot বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন কারণে হিস্টেরিয়া হতে পারে যা জেন্ডার এর উপর নির্ভর করে এবং তথাপি, মনস্তাত্ত্বিক বা, সামাজিক কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে তিনি হিস্টেরিয়াকে শারীরিক রোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করবার প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। এর পর হিস্টেরিয়া ব্যাখ্যা করবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন Freud যিনি মনঃসমীক্ষণের জন্য বিখ্যাত। হিস্টেরিয়াকে মনঃসমীক্ষণের জন্মদাত্রী হিসেবে অভিহিত করে Eissler বলেনঃ

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাপক বিস্তৃত নিউরোসিস/স্নায়ুরোগটি যদি হিস্টেরিয়া না হত তবে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার অনেক বিঘ্নিত, বিলম্বিত অথবা না হওয়াটাও সম্ভবপর ছিল।" (Eissler in Showalter 1993:320)

হিস্টেরিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Freud বলেন যে, বিরক্তিকর/বাধাপড়া কোন যৌন অভিজ্ঞতা যা হয়তোবা ভুলে যাওয়া হয়েছে কিংবা, দাবিয়ে রাখা হয়েছে সেখান থেকে যে আঘাত তৈরি হয় সেটাই পরবর্তীতে হিস্টেরিয়ার দিকে ধাবিত করে।

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা পরবর্তীতে এ ধরনের ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। কেননা, হিস্টেরিয়ার এ ধরনের ব্যাখ্যায় যৌনতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী যত গুরুত্ব পায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ফ্যাক্টরগুলো এই অতি গুরুত্বারোপের কারণে দৃশ্যপট থেকে আড়ালে সরে যায়। অধুনা সময়কালে এটা স্বীকৃত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যে, হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হবার প্রবণতা নারীদের বেশি থাকলেও পুরুষেরাও হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, এই আবিষ্কার কয়েক শতাব্দী আগেকার। কালভেদে, প্রেক্ষাপটভেদে, জেন্ডারভেদে হিস্টেরিয়া নামক রোগ/অসুস্থতার নামকরণের ভিন্নতা যাকে Showalter (1993:293) অভিহিত করেছেন "জেন্ডারড বিপরীতার্থক দ্বিবিভাজন" ("gendered binary opposition") হিসেবে যা নারী ও পুরুষভেদে নিম্নলিখিত-

রেনেসাঁ সময়কালে- হিস্টেরিয়া / মেলানকলি
সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে- হিস্টেরিয়া / হাইপোকন্ড্রিয়া
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে- হিস্টেরিয়া / নিউরেস্থিনিয়া
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে- হিস্টেরিয়া / শেল শক সিন্ড্রোম
ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের পরিসরে- হিস্টেরিয়া/ অবসেশনাল নিউরোসিস

লক্ষ্য করে দেখবার বিষয় হল যে, যে প্রত্যয় (Term) এ-ই পরিবর্তন হউক না কেন পুরুষের ক্ষেত্রে প্রত্যয় এর পরিবর্তনে যতটা সচেতন প্রচেষ্টা তা নারীর ক্ষেত্রে ততটাই অনুপস্থিত। এমনটি কেন? এক্ষেত্রে প্রথমত দেখা দরকার হয়ে পড়ে যে, কিভাবে শুরু থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে হিস্টেরিয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে? শুরুর দিককার এ বিষয়ক অনেক লেখালেখিতে, অধ্যয়নে দেখা যায় যে, হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষকে অ-পুরুষসুলভ (unmanly), মেয়েলী ভাবাপন্ন (womanish) অথবা সমলিঙ্গীয় যৌনতা চর্চাকারী (homosexual) বলে মনে করা হত। পুরুষত্বের পরিসরে নারীবাচক যে কোন উপাদানই যেন খোদ রোগের একটি লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়-অবস্থাদৃষ্টে এমনটাই মনে হয় (Showalter 1993:289)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, "A System of Medicine" গ্রন্থে হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত পুরুষ সম্পর্কে John Russel Reynolds লিখেন-

"হয় মানসিকতা অথবা নৈতিকতার দিক থেকে মেয়েলী গঠনের" (Reynolds in Showalter 1993:289)

যে কোন কারণেই হউক পুরুষের হিস্টেরিয়া নিয়ে Charcot এর কাজ মেডিকেল ডিসকোর্সে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়নি, ইতিহাস কেনইবা অগাস্টিন (Charcot এর চিকিৎসাধীন সব থেকে উল্লেখযোগ্য হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারী) কে মনে রেখেছে আর

Charcot বর্ণিত অপরাপর হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষদেরকে বিস্মৃত হয়েছে তা ভেবে দেখবার বিষয় যা কিনা এ 'রোগ/অসুস্থতা'র লিঙ্গীয়-রাজনীতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা ব্যতিরেকে বোঝা সম্ভবপর নয়। । বৃটিশ চিকিৎসক সমাজে পুরুষের হিস্টেরিয়ার ধারণা সব সময় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে- হয় কোন প্রত্যয়ীকরণের (Terminology) ছদ্মাবরণে, জৈবিক বিশ্লেষনের দ্বারা, অস্বীকার এবং ছুঁড়ে ফেলার নানা ধরনের মধ্য দিয়ে (Showalter 1993:313)।পরিহাসের বিষয় হল যে, Charcot এর মৃত্যুর পর তার সব থেকে নাম করা শিক্ষার্থী Sigmund Freudও পুরুষের হিস্টেরিয়াকে দৃশ্যপটের আড়ালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। পুরুষের হিস্টেরিয়ার অস্তিত্ব কে যদিও তিনি ক্রমাগত স্বীকার করে যেতে থাকেন তথাপি, ভিয়েনাতে হিস্টেরিয়ার উপর Freud এর কাজ নারীদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে (Showalter 1993:314, 315)।

আবার, Dr. Charles S. Myers প্রথম বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন সময়ে ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে সাময়িক বিস্মৃতি, দুর্বল দৃষ্টিশক্তি এবং আবেগিক হতাশাগ্রস্ত'র মত লক্ষণ দেখতে পান যেগুলোকে তিনি হিস্টেরিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, পূর্বাপর চিকিৎসকদের মতই তিনিও এক্ষেত্রে হিস্টেরিয়া নামটি ব্যবহার করতে চাননি যেহেতু রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত পুরুষদের উপর এ রোগের তকমা লেগে যাওয়াটা প্রকারান্তরে 'কাপুরুষত্ব'র লক্ষণ কেননা প্রবল মেডিকেল ডিসকোর্স অনুযায়ী, এ রোগটা নামকরণের দিক থেকে নারীদেহের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, হিস্টেরিয়াগ্রস্ত পুরুষদের নিয়েও প্রচলিত ছিল নানা ধরনের নির্মাণ যা আমরা একটু আগেই জেনেছি। ফলশ্রুতিতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে রোগটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Myers বলেন যে, বিস্ফোরিত শেলের কাছাকাছি থাকায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আঘাত লাগবার কারণে এরূপ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তিনি রোগটির নাম দেন "শেল শক" ("Shell shock") যদিও Showalter এর মতে, পরবর্তীতে Myers বিস্ফোরিত শেল এবং স্নায়ুবিক লক্ষণগুলোর মধ্যে কোন জৈবিক সম্পর্ক দেখাতে পারেননি (Showalter 1993:321)। অন্যদিকে, ফরাসী চিকিৎসকেরা হিস্টেরিয়া নামটি ব্যবহার করতে চাননি যেহেতু Charcot এর সুনামের সাথে এক ধরনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ছিল। তৎকালীন সেনা-কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অসুস্থতাকে 'কাপুরুষতা'র লক্ষণ হিসেবে দেখেন এবং কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এ রোগে আক্রান্ত দের কোর্ট মার্শাল করে গুলি করে মারার কথা চিন্তা করেন (Showalter 1993:321-322)।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই নারীদের হিস্টেরিয়াগ্রস্ততা কে যেভাবে অর্থ দেয়া হয়েছে তা নারী শরীরকে ঘিরে নেতিবাচক অর্থ বাচকতা তৈরি করে যেখানে নারী চিত্রিত হয় 'নার্ভাস' সত্ত্বা হিসেবে, যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারী সামাজিকভাবে 'অযথার্থ' বলে প্রতিপন্ন হয় আর একইসাথে হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারীর শরীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য যথার্থ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে (Foucault in Petersen and Bunton 1997:160)।

যা হউক, অধুনা সময়কালে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে হিস্টেরিয়া/ 'গণ হিস্টেরিয়া'র কারণ হিসেবে যেভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয় সেখানে Sydenham এর ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে কিনা তিনি বলেন যে, হিস্টেরিয়া হল সভ্যতার সক্রিয় রূপ অর্থাৎ, যে সব লক্ষণ হিস্টেরিয়ার দিকে ধাবিত করে সেগুলো সংস্কৃতিকে "অনুকরণ" করে উৎপত্তি লাভ করে (Rousseau 1993:145)। তার মতে, হিস্টেরিয়া অন্য সব রোগের অনুকরণ করে। হিস্টেরিয়া একভাবে সভ্যতাকেও অনুকরণ করে। এই প্রক্রিয়ায় Sydenham রোগ হিসেবে হিস্টেরিয়াকে কেবল শরীর কিংবা, কেবল মনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখবার মানসিকতা থেকে সরে এসে রোগের সাথে সমাজ সংস্কৃতিকে যুক্ত করে দেখবার প্রয়াস পান। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে 'গণ হিস্টেরিয়া' র ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব লেখালেখিগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করে Bartholomew (1990) অভিমতে ব্যক্ত করেন যে, এসব সাহিত্যের অধিকাংশই এমপিরিসিস্ট ঐতিহ্যের উপর ভর করে অসুস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করে তাকে কতকগুলো লেবেল এঁটে দিয়ে (গড় আই-কিউ থেকে নিম্ন আই-কিউ সম্পন্ন, আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদার নিম্ন সারিতে অবস্থানকারী) এবং পাশাপাশি চাপ এর একটি সুনির্দিষ্ট উৎসকে (পরীক্ষা, বন্ধুর মৃত্যু, অদ্ভুত/ অপরিচিত ধরনের গন্ধ, পারমানবিক হামলার আতঙ্ক) সনাক্ত করার মধ্য দিয়েই। যার প্রেক্ষিতে গবেষকগণ একটা নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে বসবাসরত মানুষজনের নির্দিষ্ট বাস্তবতাকে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠ করতে প্রায়শ-ই ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে তার যুক্তি হচ্ছে যে, হিস্টেরিয়া/ 'গণ হিস্টেরিয়া'কে বোঝার জন্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী হওয়া প্রয়োজন - পর্যবেক্ষণকারী, অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং বৃহত্তর কমিউনিটি কিভাবে 'গণ হিস্টেরিয়া'কে ব্যাখ্যা করে তাকে খতিয়ে দেখা এবং একই সঙ্গে এসব ব্যাখ্যার প্রভাব/ফলাফল সমূহকে বিশ্লেষণ করা।

আবার, নারীবাদীদের কাজে হিস্টেরিয়া/ 'গণ হিস্টেরিয়া' কে দেখা হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন আঙ্গিকে । যেমন, Bordo (1989:13, 16) তার কাজে হিস্টেরিয়াকে "সংস্কৃতির ট্যাক্সট" ("Text of Culture") হিসেবে পাঠ করবার উপর জোর দেন। কেননা তার

মতে, হিস্টেরিয়াকে যেভাবে নারীর অসুস্থতা বলে বয়ান করা হয় তার মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির জেন্ডার্ড দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, নারী সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক বিবৃতি (Cultural Statement) একভাবে উঠে আসে যা প্রকারান্তরে সমাজের জেন্ডার বিবৃতিকে পাঠ করবার রাস্তা দেখায়। Bordo তার বিশ্লেষণে Foucault ও Bourdieu'র ধারণাকে সরাসরি ব্যবহার করে বলেন যে, সংস্কৃতির একটা রূপক হিসেবে শরীরকে পাঠ করা যায় যেখান থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, শরীর কেবলমাত্র সংস্কৃতির একটা ট্যাক্সট-ই নয় বরং, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ক্ষেত্রও (Locus) বটে। অন্যদিকে, Ong (1987) দেখিয়েছেন যে, মালয়েশিয়ার কারখানার নারী শ্রমিকেরা সময়ে-সময়ে 'গণ হিস্টেরিয়া'য় আক্রান্ত হয় যাকে হয়ে স্থানীয় লোকজন ''আত্মার ভর করা'' (''spirit possession'') হিসেবে বিবেচনা করে থাকে । তিনি তার কাজে পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষাপটে নারীদের উপর''আত্মার ভর করা''-র বিষয়টিকে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক নারীর বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বুঝবার মধ্য দিয়ে হিস্টেরিয়াকে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র'র বিরুদ্ধে নারীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশক্ষম ভাষা/জানান দেবার ভাষা/ নারীর প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। মূলত, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রতি নানা ধরনের বস্তুগত ও সামাজিক বঞ্চনা আর অধস্তনতার প্রেক্ষিতে যে 'চাপ' তৈরি হয় তাকে প্রতিরোধ করার কৌশল হিসেবে ''আত্মার ভর করা''কে ব্যবহার করে (Broch in Naher 2008:190) অনুরূপ ঘটনা (যেমন-ভূতে ধরা.জ্বীনে ধরা যাকে কিনা আবার জৈব চিকিৎসকরা হিস্টেরিয়াগ্রস্ততা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন) বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদের ক্ষেত্রেও প্রায়শ ঘটে থাকে বলে Blanchet (1984) উল্লেখ করেন যাকে তিনি আবার চিহ্নিত করেছেন নারীর 'উপ-সংস্কৃতি' ('sub culture') হিসেবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারীকে ঘিরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স যা কিনা আবার নারীত্বের কিছু 'আদর্শমান' কে বেঁধে দিয়ে নারীকে সেই ছাঁচে গড়তে বাধ্য করে এই সব মুহূর্তে 'দুর্বল' নারীও 'নারী' হিসেবে তার উপর চর্চিত আধিপত্য,কর্তৃত্ব'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে, চ্যালেঞ্জ করে (Martin in Gardner 1992 : 15)। আমাদের কাজের পরিসরে আমরা হিস্টেরিয়া/'গণ হিস্টেরিয়া'র আলোচনায় নারীবাদীদের এসব তাৎপর্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে একটি বিশেষ 'রোগ/অসুস্থতা'র প্রেক্ষাপটে নানা অসমতার স্বরূপকে বুঝতে চাইব এবং একই সাথে নারীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে (যেহেতু আক্রান্ত নারীও কোন সমসত্ব ক্যাটাগরিতে পড়েন না) যেভাবে পরিবর্তনশীল সমাজের লিঙ্গীয় মতাদর্শের সাথে নিরন্তর বোঝাপড়া করে চলে, প্রতিরোধের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে তাকে বুঝতে চাইব আর এর মধ্য দিয়েই আমরা নারীর উপর চর্চিত ক্ষমতার নানাবিধ ধরনকে দেখতে চেষ্টা করব ।

৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'গণ হিস্টেরিয়া': 'ইনডেক্স কেস'[২] আদিয়াবাদ

১৪ জুলাই, ২০০৭ ইং তারিখে ব্যাপকহারে অসুস্থতার ঘটনাটি ঘটলেও প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা দেখি যে, এই তারিখের কমসে কম এক সপ্তাহ আগে থেকেই এই বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী এ 'রোগ/অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু, ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত এরূপ প্রতিটি 'অসুস্থতা'র ঘটনাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্ন 'অসুস্থতা/অভিনয়' হিসেবেই বিবেচনা করে আসছিলেন। কারণ, প্রচন্ড গরমের কারণে শিক্ষার্থীরা সকালবেলার রোদে দাঁড়িয়ে স্কুলের প্রাত্যহিক সমাবেশ/এসেম্বলিতে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছিল এবং তারই অংশ হিসেবে কেউ কেউ এসেম্বলিতে অজ্ঞান হয়ে যাবার অভিনয়ও করেছিল। যা হউক, 'অসুস্থতা'র এরূপ ঘটনাজনিত প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরোল্লেখিত বিচার-বিবেচনায় ছেদ পড়ে ১৪ জুলাই, ২০০৭ ইং তারিখের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও 'অসুস্থতা'র এ ঘটনাটিকে বেশ গুরুত্বের সাথে নেয়া হয় ।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে প্রথম একজন মেয়ে শিক্ষার্থী 'অসুস্থ' হয়ে পড়ে। পত্র-পত্রিকার বরাত থেকে আমরা দেখি যে, সময়ের ব্যবধানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যেখানে ১১-১২ তারিখ পর্যন্ত ১৫/২০ জনের মত শিক্ষার্থী এ 'অসুস্থতা' য় আক্রান্ত হয়। ১২ তারিখ পর্যন্ত 'অসুস্থতা'য় আক্রান্তদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসাদানের (যেমন, মাথায় পানি ঢালা) পর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একই দিনে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি 'অসুস্থতা'র বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন। এর মধ্যে ২/১ জন বাড়ীতে গিয়ে পুনরায় 'অসুস্থ' হয়ে পড়ে। ১৩ তারিখে নরসিংদী সদর হাসপাতাল থেকে একটি মেডিকেল টীম যায় স্কুলে। 'অসুস্থ' হয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন এবং ওই দিন তাদের নিয়ে আসতে বলেন। ঐ একই তারিখে ৫/৭ জনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। যাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর (যেমন- মাথায় পানি ঢালা, চেক-আপ করা প্রভৃতি) বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত সবাইকে বিশ্রাম নেয়া এবং শরবত ও পানি জাতীয় খাবার খাওয়ার উপদেশ প্রদান করা হয়। পরদিন শনিবার ১৪ তারিখে সকাল ৮ টায় স্কুল চালু হলে পর দুই ঘন্টার মধ্যেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, আয়া সব মিলিয়ে ৭০/৮০ জনের মত (৫০ এর উর্ধ্বে সংখ্যা ছাড়িয়ে গেলে পর স্কুল কর্তৃপক্ষ হতবিহবলতার কারণে আর রেকর্ড রাখতে পারেননি) নতুন করে আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে আমরা স্কুলের সংরক্ষণ করা রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, ৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী; ১ জন শিক্ষক,১ জন শিক্ষিকা এবং ১ জন আয়া সেদিন 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হন। ১৪ জুলাই এর পরও ৩জন ছেলে (৯ম শ্রেণীর ২

জন ও ১০ম শ্রেণীর ১ জন) ও ৮ জন মেয়ে (৬ষ্ঠ, ৯ম ও১০ম শ্রেণীর মেয়েরা তবে, ১০ম শ্রেণীর মেয়েরা সংখ্যায় বেশী) পুনরায় একই ধরনের 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হয়।উল্লেখ্য যে, এই পরিসংখ্যানটি আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ডটি থেকে পাই যেখানে পুনর্বার 'অসুস্থ' হয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কলেজ সেকশনের ১ জন ছেলেও 'অসুস্থ' হয়েছিল।

যাই হউক, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে খুব দ্রুত নরসিংদী সদর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক দল ও অ্যাম্বুলেন্স স্কুলে এসে পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সহায়তায় বিষয়টি সাভার সেনানিবাসকে অবহিত করা হয়। একই দিনে বিকেলের মধ্যেই সাভার সেনানিবাস থেকে সেনাবাহিনীর চিকিৎসক সহ একটি 'বিশেষ' দল স্কুলে উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীদের ভাষ্য অনুযায়ী র‍্যাব, পুলিশ, ডগ স্কোয়াড, বোমা বিশেষজ্ঞরাও পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অসুস্থদেরকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হলে তাদেরকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এরকম একটা নাজুক পরিস্থিতিতে প্রথমে ৩ দিনের জন্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে স্কুলটি ৭ দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।

১৪ তারিখ বিকালের মধ্যেই সামরিক বাহিনীর লোকজন উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সেখানে উপস্থিত অন্য চিকিৎসক দলকে সহায়তা করলেও তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানের বিষয় ছিল-এই ব্যাপক 'অসুস্থতা'র সাথে 'নাশকতামূলক' কর্মকান্ডের কোন ধরনের কোন যোগাযোগ আছে কিনা সেটিকে খতিয়ে দেখা। তারা স্কুলের প্রত্যেকটি শ্রেণীকক্ষে অনুসন্ধান চালানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের খাবার পানি, সামনে বিক্রি হওয়া দোকানের খাবার, বিদ্যালয়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে। পাশাপাশি, র‍্যাবের ডগ-স্কোয়াডও পুরো স্কুলে অনুসন্ধান কাজ চালায়। কিন্তু, কোন ধরনের বিস্ফোরক/গ্যাসের আলামত না পাওয়ায় সেনাবাহিনীর লোকজন বিদ্যালয়ের কোন ব্যক্তি সম্ভাব্য 'নাশকতামূলক' কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখতে গেলে তখন স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দুজন শিক্ষকের নাম আসে। তাদের নাম আসে কারণ, স্কুলের লোকজন ও স্থানীয় মানুষজন তাদেরকে জামায়াত-শিবির এর সমর্থক হিসেবে জানে। ফলে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

'নাশকতামূলক' তৎপরতার বিষয়টিকে খতিয়ে দেখাটা বৈশ্বিক এবং স্থানিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত কতকগুলো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করে দেখা যেতে পারে। যেমন- ৯/১১'র ঘটনা (আমেরিকার টুইন টাওয়ার্সে বোমা হামলার ঘটনা যার কারনে আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে); দেশীয় প্রেক্ষাপটে ১/১১'র ঘটনা (অর্থাৎ, ২০০৭ সালের

শুরুতেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকটের কারণে জরুরি অবস্থা জারি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই 'অনির্বাচিত' সরকার যাকে কিনা অভিহিত করা হয়ে থাকে 'সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ধারণা এটাই সর্বপ্রথম); ২০০০ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা, তারও পূর্বে উদীচি'র অনুষ্ঠান ও রমনা বটমূলে বোমা হামলার ঘটনা, এছাড়া ২০০৭ এ দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফলকনামায় হুমকি প্রদানের মত উল্লেখযোগ্য সবগুলো ঘটনা মিলিয়ে এক ধরনের সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডের আশংকা করাটা অযৌক্তিক ছিল না। আর, তার উপর আদিয়াবাদে যখন কেউ কেউ বলে যে, গ্যাসের গন্ধ পাওয়া গেছে তখন সব মিলিয়ে ফলশ্রুতিতে ''নাশকতার ধারণা/তত্ত্ব''কে এড়িয়ে যাবার মত পরিস্থিতিও ছিল না।

কিন্তু, সেনাবাহিনী তাদের দ্রুত তদন্তে 'নাশকতামূলক'কর্মকান্ডের কোন প্রমাণ/ভিত্তি খুঁজে না পেলে তখন তারাই 'রোগ/অসুস্থতা'র ঘটনাটিকে জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করার দিকে মনোনিবেশ করার কথা বলে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অসুস্থ হওয়া মাত্রই ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল মাঠে নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। ১৬ জুলাই রবিবার রাতে স্কুল মাঠে সেনাবাহিনী একটি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে, মাইকিং করে অভিভাবকদেরকে এই 'রোগ/অসুস্থতা' র বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য স্কুল-সমাবেশে সমবেত হওয়ার জন্য বলা হয়। অন্যদিকে, অন্য যে কোন চিকিৎসাবিধান ও চর্চাকে (ঝাড়-ফুঁক, কবিরাজী, পানি-পড়া, তেল পড়া প্রভৃতি) নিরুৎসাহিত করা হয়/গ্রহণ না করবার জন্য বলা হয়। স্কুলের এই বিশেষ সমাবেশে অভিভাবকদের 'সচেতন' করবার পাশাপাশি ('রোগ/অসুস্থতা'র বিষয়ে) স্কুলে যাতে তারা বাচ্চাদেরকে পাঠান তাদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে সেই সমাবেশে মেডিকেল টীমের লোকজন বলেন, ''এটা কোন রোগ না।'' ১৬ জুলাই রাতে সেনাবহিনী কর্তৃক আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীতে প্রায় ২০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ১৪ তারিখের পর থেকে খুব দ্রুতই আদিয়াবাদের ঘটনাস্থলে বিভিন্ন চিকিৎসক/ বিশেষজ্ঞ দল সহ মিডিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। পরবর্তী কয়েকদিনে আদিয়াবাদে ঢাকাস্থ আইসিডিডিআর,বি; মাতৃসদন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক ও গবেষণা-দল গিয়েছিল। আর, এভাবে আদিয়াবাদ হয়ে ওঠে 'ইনডেক্স কেস'।

৪.'রোগ', 'রোগ নয়', 'অসুস্থতা' আর বহুবিধ নামকরণ নিয়ে চিকিৎসকদের নানা মতামত: সংকটে আপতিত স্থানীয় মানুষজনের নতুন নামকরণ 'পইড়া যাওয়া'

আদিয়াবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'গণ হিস্টেরিয়া'র সংজ্ঞায়ন, কারণ প্রভৃতি নিয়ে চিকিৎসকেরা ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেছেন । তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল, সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকদল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পাশাপাশি বিভিন্ন মেডিকেল টীম এর বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকেরা স্থানীয় মানুষজনকে চিকিৎসা সহায়তা, সভা-সমাবেশ করে সচেতন করা ছাড়াও এই 'রোগ/অসুস্থতা' সম্পর্ক নানা তথ্য দিয়েছেন। এছাড়া, সরকারী তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে খুব দ্রুত পত্র-পত্রিকাসহ রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে লিফলেট/প্রচারণাপত্র প্রচার করে জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবগত ও সচেতন করবার উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞগণও এ বিষয়ে নানা বক্তব্য কে তুলে ধরেন জাতীয় পর্যায়ে নানা অনুষ্ঠানে আলোচনার পাশাপাশি লেখালেখির মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, 'রোগ/অসুস্থতা'র নামকরণ নিয়ে যেমন বিভিন্ন মতামত ছিল তেমনি এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা'কে 'রোগ' নাকি 'অসুস্থতা' হিসেবে দেখা হবে তা নিয়েও চিকিৎসকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 'রোগ/অসুস্থতা'কে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অস্পষ্টতা, ভিন্নতা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সংকট তৈরি করে।

১৪ তারিখে ব্যাপক 'অসুস্থতা'র ঘটনার পর ১৫ তারিখে উল্লেখযোগ্য সবগুলো জাতীয় দৈনিক ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত খবর 'অজ্ঞাত রোগ' নামে পরিবেশিত হয়। অন্যান্য প্রচারমাধ্যমেও বিশেষত টিভি চ্যানেলগুলোতে খবরটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ১৫ তারিখে ঢাকা মেডিকের কলেজ 'অজ্ঞাত রোগ'-টিকে প্রাথমিকভাবে 'ম্যাস-হিস্টেরিয়া' বলে সনাক্ত করবার পর এবং ১৯ তারিখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা একে ''ম্যাস-সাইকো/সোশিওজেনিক ইলনেস'' বলে চিহ্নিত করবার পরও পত্র-পত্রিকার খবরের শিরোনামে এটি 'অজ্ঞাত রোগ' হিসেবে পরিবেশিত হতে থাকে যদিও ভিতরের বিস্তরিত বিবরণে আবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সনাক্তকৃত রোগের নাম ব্যবহার করতে দেখা যায়। রোগ ছড়িয়ে পড়বার ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা মিডিয়াকেও দায়ী করেন যেহেতু দেখা, শোনার মধ্য দিয়ে এই 'রোগ/অসুস্থতা' ছড়িয়ে পড়ে।

আবার, ১৫ জুলাই ২০০৭ সালের প্রথম আলোয় প্রকাশিত ''নরসিংদীতে অরো ২৩ শিক্ষার্থী অসুস্থ: চিকিৎসকেরা বলছেন মনস্তাত্ত্বিক রোগ'' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদভাষ্যে দেখা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান মোঃ আবুল ফয়েজ বলছেন, ''এটা শারীরিক ব্যাধি নয়, এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বলে

বোধ হচ্ছে। একে ম্যাস হিস্ট্রিয়া বলা যেতে পারে।" অন্যদিকে, ১৯ জুলাই ২০০৭ সালের প্রথম আলোয় প্রকাশিত "বিশেষজ্ঞদের মতে রোগ নয় এটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা"-শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদভাষ্যে দেখা যায় যে, রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাকেন্দ্র (IEDCR)-এর পরিচালক অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বলছেন, "...এটা কোন রোগ নয়। এটা 'ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস' বা গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা। " পক্ষান্তরে, ২০ জুলাই ২০০৭ সালের প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ১৯ জুলাই ২০০৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা রোগের নাম "গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা" হিসেবে তুলে ধরেন আর "আজ থেকে এটি আর কোন অজ্ঞাত রোগ নয়" বলে ঘোষণা দেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ ডাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন আমাদের সাথে তার সরাসরি আলাপচারিতায় বলেন, "... অবশ্য হিস্টেরিয়ার লক্ষণ ও এই রোগের লক্ষণগুলো প্রায়ই একরকম বলে একক রোগীর ক্ষেত্রে আমরা তাকে হিস্টেরিয়া বলেই চিহ্নিত করেছি। কিন্তু, এক্ষেত্রে রোগটি সমজাতীয়/বয়সী/ মানসিক সমস্যার মধ্যে থাকা ব্যক্তির মধ্যে দেখা, শোনার মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। যে কারণে প্রথমে তাকে 'ম্যাস বা গণ-হিস্টেরিয়া' নামে উল্লেখ কর হয়েছে। কিন্তু, হিস্টেরিয়ার রোগ হিসেবে নির্দিষ্ট ইতিহাস ও নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকায় আমরা একে আমাদের দেশে ম্যাস সাইকো/সোশিওজেনিক ইলনেস হিসেবে অভিহিত করার কথা বলছি। পৃথিবীর অনেক দেশেই তা এভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। কিংবা আমেরিকান হেলথ অ্যাসোসিয়েশন এই ধরনের লক্ষণ ও অসুস্থতাকে সংজ্ঞায়ণ করে কনভার্সন ডিসঅর্ডার হিসেবে। যখন নিউরোলজিক্যাল সমস্যা শারীরিক উপসর্গের মাধ্যমে দেখা দেয় তখন তাকে হিস্টেরিয়া বলে। মানে বিষয়টি শারীরিক নয় মানসিক রোগ...অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মানসিক সমস্যা আছে বা হিস্টেরিয়া বলতে অস্বস্তি বোধ করেন। তাই আমরা ডাক্তাররা এখন প্রেসক্রিপশনে কোড হিসাবে Hysterical Conversion Reaction/HCR ব্যবহার করি...হ্যাঁ...সাধারণ ধারণা হিসেবে হিস্টেরিয়া নাম হিসেবে সর্বত্র বহুল ব্যবহৃত..."

নিউইয়র্ক প্রবাসী একজন চিকিৎসক মুজিবুর রহমান এর বক্তব্যে 'ম্যাস হিস্টেরিয়া' আর 'ম্যাস সোশিওজেনিক ইলনেস' সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ২৫ জুলাই,২০০৭ ইং তারিখে প্রকাশিত নয়া দিগন্ত পত্রিকায় তার অভিমতে বলেন, "হিস্টেরিয়া যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে, অনুরূপভাবে একইসাথে বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকহারে বহু নারী-পুরুষ আক্রান্ত হতে পারে। আর ঐ অবস্থাকে বলা হয় 'ম্যাস হিস্টেরিয়া বা ম্যাস

সোশিওজেনিক ইলনেস'... এতে শারীরিক কর্মব্যতয় ঘটলেও এর পেছনে শারীরিক ও স্নায়ুবিক কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না, পরীক্ষার ফলাফলও স্বাভাবিক থাকে।''

অন্যদিকে, যে সমস্ত চিকিৎসক আদিয়াবাদের ঘটনাকে 'রোগ' নয় বরং মানসিক 'অসুস্থতা' বলে অভিহিত করেন তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম তার অভিমতে বলেন, ''একটি দৈনিক পত্রিকা শিরোনাম করেছে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 'এটি (গণ-হিস্টেরিয়া) কোন রোগ নয়, মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা'। বিনয়ের সাথে বলতে চাই, মানসিক অসুস্থতাও শারীরিক রোগের মত এক ধরনের ব্যাধি। একে রোগ হিসেবে গণ্য না করলে একদিকে যেমন এর চিকিৎসা, পরিচর্যা ও প্রতিরোধের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়, তেমনি যারা আক্রান্ত হন তারা 'ভান' করেছে বলে মনে করে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই সব ধরনের মানসিক অসুস্থতাকে চিকিৎসাযোগ্য ও প্রতিরোধযোগ্য রোগ হিসেবে স্বীকার করে নিলে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে...এটিকে এপিডেমিক হিস্টেরিয়া বলা যেতে পারে।''(নয়া দিগন্ত, ৩১ জুলাই, ২০০৭ ইং)

উপরে উপস্থাপিত কয়েকজন চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে 'রোগ/অসুস্থতা'টির কারণ,নামকরণ নিয়ে তাদের যে ব্যাখ্যা সেগুলো বিশ্লেষণ করলে খেয়াল করে দেখবার বিষয় যে, অনেক চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞ 'গণ হিস্টেরিয়া' কে মানসিক 'অসুস্থতা' হিসেবে দেখেছেন, কোন 'রোগ' হিসেবে নয়। আবার এমনটিও দেখি যে, অন্যান্য শারীরিক 'রোগ' এর মতই মানসিক 'অসুস্থতা'কেও চিকিৎসাযোগ্য ও প্রতিরোধযোগ্য 'রোগ' হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এর প্রতিকার প্রতিরোধ এর উপর গুরুত্বারোপ করবার কথাও বলা হয়েছে চিকিৎসকের তরফ থেকে। 'রোগ/অসুস্থতা' র নামকরণ থেকে শুরু করে খোদ 'রোগ/অসুস্থতা' কে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি - এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি স্পষ্টত দৃশ্যমান। অর্থাৎ, 'গণ হিস্টেরিয়া' কে কেন্দ্র করে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটা বিতর্ক "অসুস্থতা বনাম রোগ"- এমন বাস্তবতা বিরাজমান যেখানে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞরা সকলেই এটিকে একভাবে বিবেচনা করেন না।

চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিকভাবে 'অজ্ঞাত রোগ' টিকে 'গণ হিস্টেরিয়া' বলবার পর-পরই অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকেই এটিকে আবার ''ম্যাস-সাইকো/সোশিওজেনিক ইলনেস'' হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু, মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্থানীয় মানুষজনের বহুলাংশই 'ম্যাস/গণ হিস্টেরিয়া' হিস্টেরিয়া' নামটি বলতে পারলেও পরবর্তী নামটি বলতে পারেননি। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রথমত 'রোগ/অসুস্থতা'র নাম হিসেবে হিস্টেরিয়া'র সঙ্গে তাদের অল্প-বিস্তর পরিচিতি থাকলেও

বিশেষজ্ঞরা সর্বশেষ যে নামটির উপর জোরারোপ করেন সেটি এবারই তারা প্রথম শুনেছেন আর দ্বিতীয়ত, এটি আবার স্থানীয় মানুষজন তাদের মতাদর্শিক জায়গা থেকে (যেহেতু মানসিক রোগ 'পাগল' হবার সমার্থক বলেই বিবেচনা করা হয়), সামাজিক প্রেক্ষাপটজনিত কারণে (যেহেতু 'পাগল'/'পাগলী'- এই ধরনের ইমেজ সমাজে ব্যক্তির জন্য নেতিবাচক অর্থ বহন করে; মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষত পরবর্তীতে তাদের বিয়ে দেবার বেলায় সমস্যা হতে পারে) মেনেও নিতে পারেন না যার ধারণা আমরা আমাদের তথ্যদাতাদের ভাষ্য থেকেই পাই।

আবার লক্ষ্যণীয় যে, স্কুলে অসুস্থতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অভিভাবক সমাবেশ হয়েছিল সে সময় যখন স্থানীয় মানুষজনকে বলা হয় 'এটা কোন রোগ না'- তখন স্থানীয় মানুষজনকে এ ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্ত করে। একজন পুরুষ তথ্যদাতা প্রশ্ন তোলেন- "এতগুলান মানুষ যারা আমরা অসুস্থ হইলাম আমরা কি সবাই তাইলে ভান/অভিনয় করছি? আমরা কি পাগল?" আবার আরেকজন মহিলা তথ্যদাতা বলেন- "তারা যখন বলেন যে, এইটা কোন রোগ না তাহইলে এইটা কি?" এই প্রশ্নটি আমরা আমাদের মাঠকর্ম চলাকালীন সময় প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন-"আপনাদের কি মনে হয়? এইটা তাইলে কি?" প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সব অভিজ্ঞতার মত অসুস্থতাকে ঘিরেও নানা সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা রয়েছে যেখানে একটা অসুস্থতাকে নানাভাবে ধারণায়ন করা হয়, একটা অসুস্থতার-ই নানা ধরন-ধারন নিয়ে কথা বলা হয়; অসুস্থতার কারণ/কারণগুলোকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়। সেদিক থেকে সব মিলিয়ে আমরা যেভাবে অসুস্থতাকে ধারণায়ন করি সংস্কৃতি খোদ সেটিকে আদল দেয় (Bartholomew 1990:458)।

স্থানীয় মানুষজন প্রথমদিককার হতবিহবলকারী পরিস্থিতিতে মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের পথ্য-বিধানকে মেনে চললেও পরবর্তীতে অপরাপর চিকিৎসা ব্যবস্থার স্মরণাপন্ন হন। কেননা, বিশেষজ্ঞ/চিকিৎসকরা যেসব কারণকে (পড়া-শোনার চাপ, বয়ঃসন্ধিকালীন চাপ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, লিঙ্গীয় বৈষম্য প্রভৃতি) সনাক্ত করেন তা স্থানীয় মানুষজনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। উপরন্তু, যখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল বলেন, 'এটা কোন রোগ না' এবং ১৪-২১ জুলাই তারিখের পরেও যখন কেউ-কেউ পুনর্বার অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন অভিভাবকদের অনেকেই আর জৈব-চিকিৎসাবিজ্ঞানের চিকিৎসায় আটকে না থেকে তাবিজ-কবজ, পানি-পড়া, তেল-পড়া, কবিরাজী চিকিৎসা প্রভৃতির দ্বারস্থ হন। এত্তো ঔষধ, স্যালাইন আর হাসপাতালে দৌড়া-দৌড়ি, এতগুলো মানুষের অসুস্থতা, কারো কারো ক্ষেত্রে পুনর্বার অসুস্থতার ঘটনা এসব যখন পরিবেশিত হয় 'এটা কোন রোগ না' বলে এবং এর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও যখন মেডিকেল টীম উপস্থাপন করেনা তখন তা

স্থানীয় জনসাধারণকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত সচেতনতা সৃষ্টিকারী প্রচারপত্র ''গণ মনস্তাত্ত্বিক রোগ প্রতিরোধে জ্ঞাতব্য ও করণীয়''-এর প্রচার আর তার বিপরীতে 'এটা কোন রোগ না'- এরকম বিপরীতমুখী বক্তব্য এই 'রোগ/ অসুস্থতা'কে কেন্দ্র করে একটা অস্পষ্টতা তৈরি করে। সর্বোপরি, কোনটি 'রোগ' আর কোনটি 'অসুস্থতা'তা নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অর্থাৎ, 'রোগ আর অসুস্থতা'র মাঝখানে প্রভেদরেখা ঠিক কোথায়, কিভাবে বিরাজ করে তা নিয়ে কোন পরিষ্কার ধারণা বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকরা স্থানীয় মানুষজনের কাছে হাজির করেননি।

একটা 'রোগ/অসুস্থতা'র এত ধরনের নামকরণ, 'রোগ/রোগ না'- এ জাতীয় বিতর্ক যখন চিকিৎসকদের মধ্যে চলমান সেখানে একে তো রোগের নামকরণে উঠে আসা নামগুলো মানুষজনের কাছে এত পরিচিত না তার উপর যে নামটিকে বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়া হয় তা স্থানীয় মানুষজনের কাছে আরো সমস্যাজনক বলে প্রতীয়মান হয়। একজন চিকিৎসকের বক্তব্য থেকে আমরা দেখি যে, 'রোগ' হিসেবে হিস্টেরিয়ার নির্দিষ্ট ইতিহাস ও নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকায় তারা একে আমাদের দেশে ''ম্যাস সাইকো/সোশিওজেনিক ইলনেস'' হিসেবে অভিহিত করার কথা বলছেন যেহেতু বিষয়টি শারীরিক নয় মানসিক রোগ তাই তিনি মনে করেন যে,অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মানসিক সমস্যা আছে বা হিস্টেরিয়া বলতে অস্বস্তি বোধ করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, 'ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস' এর বাংলা করা হয়েছে 'গণ মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' এবং যারা এ 'রোগ/ অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এসেছিল তাদেরকে পরবর্তী চেক-আপের জন্য হাসপাতালের মানসিক রোগ বহির্বিভাগে ছাড় পাবার ১৫ দিন পর দেখা করার জন্য প্রেসক্রিপশনে বলা হয়। 'মানসিক রোগ/অসুস্থতা'র চিকিৎসা বলতে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে মানুষ প্রধানত বোঝে 'পাগল' এর চিকিৎসা। বলবার বিষয় হচ্ছে যে, অনুবাদ কেবলমাত্র কতকগুলো শব্দের রদবদল না। সংবেদনশীল ইস্যুতে অনুবাদকে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক দাঁড় করানো না হলে সেটা অনেক ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করে। চিকিৎসক যেখানে হিস্টেরিয়া নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বৎমহলের বিতর্কের কারণে সেই নামকে এড়িয়ে 'গণ মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' বলবার মধ্য দিয়ে বিতর্কের বাইরে থাকতে চাইছেন সেখানে স্থানীয় মানুষজনের কাছে হিস্টেরিয়ার চাইতে 'গণ মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' কোন অংশেই কম নেতিবাচক অর্থ বহন করেনা।

চিকিৎসাবিজ্ঞান কর্তৃক চিহ্নিত 'ম্যাস-সোশিওজেনিক ইলনেস' বা 'ম্যাস-সাইকোজেনিক ইলনেস'/অসুস্থতা পরবর্তী সময়ে মেয়েদের অভিভাবকদের জন্য এক ধরনের টানা-পোড়েন তৈরি করে যেহেতু সামাজিক ধারণানুযায়ী মানসিক রোগাক্রান্তকে 'পাগল' এর

সমার্থক হিসেবে ধরা হয়। মানসিক রোগের সাথে সামাজিক বিশ্বাসের এরূপ সম্পৃক্ততা নিজেদের সন্তান, পরিবারের মর্যাদা, সামাজিক অবস্থানকে সংকটপূর্ণ করে তুলতে পারে বলে তারা আশংকায় ভোগেন। 'পাগল মেয়ে', 'জ্বীনে-ভূতে ধরা মেয়ে'র বিয়ে সমস্যাজনক বলে মনে করা হয় যদিও মাত্রাগত ভিন্নতা আছে। সামাজিকভাবে এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা'র সাথে যুক্ত আছে আবার ধর্মীয় বিশ্বাস। আর এ ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকবার কারণে জ্বীনে-ভূতে ধরার লোকায়ত চিকিৎসার যতটুকই বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে, হাসপাতালের মানসিক 'রোগ/অসুস্থতা'র চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো সেই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার জায়গায় দাঁড়াতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ একজন আক্রান্ত মেয়ের অভিভাবক-মায়ের ভাষ্য তুলে ধরা যায় যেখানে তিনি আমাদের বলেন, "গরীবের মেয়েরে বিয়ে দিতে অনেক কষ্ট... মেয়ের মাথা খারাপ হয়া গেছে এর ছেয়ে কোন কিছু আছর করছে এইটাই ভালো।"

আসলে, চিকিৎসাবিজ্ঞান কর্তৃক চিহ্নিত 'ম্যাস-সোশিওজেনিক' বা 'ম্যাস-সাইকোজেনিক' যে কোন 'রোগ/অসুস্থতা'কে এর শারীরিক লক্ষণগুলোর উপর জোরারোপপূর্বক একে শারীরিক 'রোগ/অসুস্থতা'-হিসেবেই দেখবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় অভিভাবকদের আর সে কারণে একে মানসিক 'রোগ' এর পরিবর্তে শারীরিক 'অসুস্থতা' হিসেবেই তারা দেখতে আগ্রহী যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে যখন একজন মেয়ের অভিভাবক চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী জানতে পারেন যে এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা' এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তখন তিনি পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "কেবল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হলে চোখে ঝাপসা দেখবে কেন? সারা শরীরে ব্যথা করবে কেন? " (প্রথম আলো, ১৫ জুলাই, ২০০৭ ইং)।

এ রকম একটা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, আমরা আমাদের মাঠকর্মের সময় যখন তাদের সাথে এই 'রোগ/অসুস্থতা' নিয়ে কথা বলছিলাম তখন লক্ষ্য করে দেখি যে, তারা এই রোগের নামকরণ করেছেন "পইড়া যাওয়া" যেহেতু অসুস্থতার সাধারণ লক্ষণ ছিল যে সবাই পড়ে যেত অর্থাৎ, কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক; আক্রান্ত, আক্রান্ত হননি এমন শিক্ষার্থীরা থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন সবার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আলাপচারিতার সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য করি যা এই 'রোগ/অসুস্থতা' সম্পর্কে প্রবল মেডিকেল ডিসকোর্স এর বিপরীতে স্থনীয় মানুষজনের ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

এরকম একটা জটিল পরিস্থিতিকে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক বিশ্লেষণ করতে হলে এই 'রোগ/ অসুস্থতা'কে কেন্দ্র করে কে কি বলেছেন, কেন বলেছেন শুধুমাত্র এটুকুতে আটকে থাকলে তা হবে এই ঘটনাপ্রবাহের একটা খন্ডিত পাঠ। কে কি বলেছেন, কেন বলেছেন তা

অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, এই জটিল পরিস্থিতিকে পাঠ করতে হলে একটি রোগ/অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে কিভাবে জ্ঞান-ক্ষমতা সম্পর্কের চর্চা হচ্ছে (যার মধ্যে কে কি বলেছেন, কেন বলেছেন সেই বিষয়টি দেখা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে), প্রতিরোধের ঘটনা কিভাবে ঘটছে সেদিকে মনোনিবেশ করাটাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি যা বিপরীতক্রমেও সত্য (vice-versa)। নরসিংদীর ম্যাস-হিস্টেরিয়ার ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করবার পর আমরা দেখতে পাই যে, 'রোগ/ অসুস্থতা'র চিকিৎসা বিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জৈব-চিকিৎসার বিধি-বিধানকে-ই আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। প্রাথমিকভাবে রোগের কারণ সঠিকভাবে বলতে না পারলে ও 'রোগ/ অসুস্থতা'র চিকিৎসা বিধানে কি করা যাবে আর কি করা যাবে না তা বলবার কর্তৃত্ব জৈব-চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ-ই লাভ করেন যেখানে অপরাপর চিকিৎসাপদ্ধতিকে (ঝাড়-ফুঁক,কবিরাজী,পানি-পড়া প্রভৃতি) উপরোক্ত 'রোগ/ অসুস্থতা'র ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। কোনটি বৈধতা পাচ্ছে আর কোনটি বৈধতা পাচ্ছে না, কোনটি ভালো/কোনটি মন্দ এই লেখার বিবেচ্য বিষয় কোনভাবে-ই তার উপর ভর করে নয়। বরং, কোন প্রক্রিয়ায়, কিভাবে একটি বিশেষ ধরনের জ্ঞান অপরাপর জ্ঞানের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে আর তার সাথে ক্ষমতার যোগাযোগটি কোথায় সেটিকে অনুসন্ধান করা এই গবেষণার অন্যতম আগ্রহের জায়গা।

'রোগ/ অসুস্থতা'র ধারণায়নে, চিকিৎসাবিধানে জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানকে 'বিজ্ঞানসম্মত', 'আধুনিক' বলে এক ধরনের জ্ঞানকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কথা যে জন্য বলা হচ্ছে তার পিছনে কারণ হল এই যে, 'ম্যাস সাইকো/সোশিওজেনিক' বলে যে 'রোগ/অসুস্থতা' কে চিহ্নিত করা হচ্ছে তাতে আক্রান্ত হবার কারণগুলোকে সমাজ-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ((পড়া-শোনার চাপ, বয়ঃসন্ধিকালীন চাপ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,লিঙ্গীয় বৈষম্য প্রভৃতি) হিসেবে তুলে ধরা হলেও সেগুলোর কোন কার্যকরী বিশ্লেষণ হাজির করা হয়নি। অন্যদিকে, অপরাপর চিকিৎসা-চর্চাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরুৎসাহিত প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ করবার মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক বিশ্বাস, লোকায়ত জ্ঞানগুলোকে (indigenous knowledge) আমলে নেয়া হয়নি। অথচ, এ 'রোগ/ অসুস্থতা'র চিকিৎসা-বিধানে যা কিছু নির্দেশপত্র দেয়া হয়েছে তার বেশির ভাগই দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা লোকায়ত জ্ঞানগুলোর ব্যতিক্রম না। অত্যধিক গরমের দিনে অধিক পরিমাণে তরল পানীয় পান করা, যেমন- লেবুর শরবত খাওয়া, লবণ-চিনি মিশ্রিত পানি পান করা প্রভৃতি পথ্যবিধান নতুন কিছু নয়। আধুনিক/জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্র উভয়ই অপরাপর চিকিৎসাবিধানকে খারিজ করে দিয়েছে;কিন্তু, একইসাথে সরকারী সেবা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আর তার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার-সবকিছু মিলিয়ে অপরাপর ব্যবস্থাকে কাগজে-কলমে তারা নাকচ করলেও কাঠামোগত ভাবে তারা

তা প্রতিস্থাপন করতে পারেনি। এ বিষয়টি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি যে, এলাকায় মাইকিং করে এই 'রোগ/ অসুস্থতা'র চিকিৎসায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের চিকিৎসাব্যবস্থা ছাড়া অপরাপর চিকিৎসাব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করার কারণে প্রথম দিকে তা মেনে চললেও পরবর্তীতে প্রায় সকল অভিভাবক তাদের সন্তানদের চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় অধিপতিশীল জৈবচিকিৎসাব্যবস্থা কে বর্জন না করলেও পাশপাশি অপরাপর চিকিৎসাব্যবস্থারও (হোমিওপ্যাথি,কবিরাজী,পানি-পড়া,তাবিজ, ঝাঁড়-ফুঁক প্রভৃতি) স্মরণাপন্ন হন। অর্থাৎ,সন্তানের চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের তরফ থেকে একাধিক চিকিৎসাব্যবস্থাকে গৃহীত হতে দেখা যায় । সেক্ষেত্রে কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এ 'রোগ/ অসুস্থতা'র ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় (এত অ্যাম্বুলেন্স, আর্মি, র‍্যাব, পুলিশ, মেডিকেল টীম, মিডিয়ার লোকজনের আগমন) তা স্থানীয় মানুষজনের জন্য ছিল তাদের গড়-পড়তা অভিজ্ঞতার বাইরে। এ ধরনের এ 'রোগ/ অসুস্থতা' যা কিনা ছেলে-মেয়েদেরকে ব্যাপকহারে আক্রান্ত করছে; একজনকে দেখে,শুনে আরেকজন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে- এমন রোগের ধরন তারা আগে কখনো দেখেননি। একই রকমের লক্ষণ এ আক্রান্ত বিচ্ছিন্ন এক বা একাধিক অসুস্থ ব্যক্তিকে (গ্রাম্য ভাষায় যাকে তারা বলে ভুতে ধরা/ জ্বীনে ধরা) যে তারা দেখেনি এমনটি না কিন্তু, এত ব্যাপকহারে এরকম অসুস্থতার ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আর, বিচ্ছিন্ন অসুস্থতার ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করে থাকলেও ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বার ঘটনা (অর্থাৎ, ভুতে ধরা/ জ্বীনে ধরা রোগীর আশে-পাশে গ্রামের অনেক লোক সমবেত হলেও তারা তো দেখে-শুনে আক্রান্ত হয়না)'র সাথে তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে মিলাতে পারেননা। ফলে, এরকম একটা পরিস্থিতিতে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। যার কারণে একদম শুরুর দিকে মেডিকেল টীমের দেয়া চিকিৎসাবিধানের বাইরে গিয়ে স্থানীয় মানুষজন তাদের ছেলে-মেয়েদের চিকিৎসা করাননি। কিন্তু খুব দ্রুতই এ বাস্তবতার রদবদল ঘটে।

Mulling(1984) বলেন যে, যেভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো সংগঠিত হয়, মেনে চলা হয় অথবা, তাতে পরিবর্তন সাধিত হয় চিকিৎসা জ্ঞানের কাঠামো, বন্টন এবং উপযোগিতা/ব্যবহার তার সাথে সরাসরি আন্তসম্পর্কে যুক্ত। আবার অন্যদিকে, আরোগ্যবিধানের (healing) সব রকমের কার্যক্রম (act) বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক ও বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো জোরদার করতে পারে কিংবা, তাতে পরিবর্তন সাধন করতে পারে আর সেটি নির্ভর করে এসব সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গির পারস্পরিক কার্যকারিতার (interplay) উপর।

Medical encounter এর প্রতি মানুষজন যেভাবে সাড়া দেয় তাকে একটা বহুমাত্রিক বাস্তবতার জায়গা থেকে Foucault দেখেছেন। তার মতে, 'রোগী/অসুস্থ' ব্যক্তি আধুনিক চিকিৎসাজ্ঞিানের সাপেক্ষে কোন 'নিষ্ক্রিয় সাবজেক্ট' না। সে যেমন তার ভোক্তা হতে পারে,

সে তাকে খারিজ/প্রত্যাখ্যানও করতে পারে, আবার সে দুটোর মাঝামাঝি অবস্থানও নিতে পারে (Petersen & Bunton 1997:105)। আমাদের গবেষণা সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মে আমরা দেখতে পাই যে, 'গণ হিস্টেরিয়া'র প্রথম ধাক্কায় স্থানীয় মানুষজন কোনভাবেই তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুমোদিত পথ্য, ঔষধ ছাড়া অন্য কোন ঔষধ, পথ্য/চিকিৎসাব্যবস্থার দ্বারস্থ হননি। কিন্তু,আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন 'রোগ/ অসুস্থতা'র কোন সুনির্দিষ্ট কারণ তাদেরকে জানাতে পারেনা/জানাতে পারলেও সেগুলো তাদের মনঃপুত হয়না এবং মেডিকেল টীমের লোকজন যখন বলে "এটা কোন রোগ না"- তখন স্থানীয় লোকজন পরবর্তীতে অপরাপর চিকিৎসাব্যবস্থার দ্বারস্থ হন। কেননা, "এটা কোন রোগ না" বলবার পরও অনেকে পুনর্বার অসুস্থ হয়েছে।

এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করা হল সেখানে স্থানিক মানুষজনের আচরণকে সাদামাটা অর্থে প্রতিরোধ বলে রোমান্টিসাইজ করবার কোন ইচ্ছা আমরা পোষণ করছিনা। প্রাত্যহিক জীবনে অধিপতিশীল শ্রেণী কর্তৃক নির্মিত মতাদর্শ ও জ্ঞানকে যে মানুষজন প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেয় না আমাদের বলবার বিষয় হল সেটা। বিদ্যমান কোন জ্ঞান; অবস্থা কিংবা, ব্যবস্থাকে প্রশ্নহীনভাবে মেনে না নেয়া/তাকে প্রশ্ন করা/সেগুলোকে ঘিরে বিরুদ্ধ কোন ডিসকোর্স দাঁড় করানো- এ সব কিছু-ই প্রতিরোধের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল/পন্থা। অধিপতিশীল এজেন্টই কেবলমাত্র ক্ষমতাকে ধারণ করে এমন না বরং, জটিল সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই নেটওয়ার্কগুলোতে প্রান্তিক এজেন্ট যা করে তা থেকে বোঝা যায় যে, অধিপতিশীল এজেন্ট কি করছে আর তাতে করে অধঃস্তন এজেন্ট এর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে কিনা/হতাশা, টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে কিনা অর্থাৎ, পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপটাকে অনুধাবন করা যায় (Rouse in Gutting 1994:106)। ক্ষমতাবান এজেন্ট এর ক্ষমতা গঠনে সমর্থন আর প্রতিরোধ উভয়ই কাজ করে আর সে কারণে ক্ষমতা কেবল চাপিয়ে দেয়াকে নির্দেশ করেনা বরং, নিরন্তর চলমান টানা-পোড়েন আর সংগ্রামও ক্ষমতার অনিবার্য নিয়তি (প্রাগুক্ত 1994:109)।

৫.'গণ হিস্টেরিয়া' ও হিস্টেরিয়া'র লিঙ্গীয় নির্মাণের স্বরূপ:

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক কাল থেকে এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা'র সাথে নারীকে জুড়ে দেখবার প্রবণতা বিদ্যমান যেহেতু এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা'র নামকরণের সাথে নারীদেহের যুক্ততা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতায় 'গণ হিস্টেরিয়া'র নানা ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে, নারীরাই বেশি আক্রান্ত হলেও পুরুষরা যে আক্রান্ত হন না বিষয়টি মোটেও তা নয় যা অগেই আলোচনা করা হয়েছে। নরসিংদীতে মাঠ-গবেষণার প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে, আক্রান্ত ৫২ জনের মধ্যে ১০ জন-ই ছিলেন পুরুষ।

কেনইবা নারীরা বেশী আক্রান্ত হন এমন প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসকরা এ 'রোগ/অসুস্থতা'র 'সামাজিক কারণ' (প্রধানত যেগুলো ঘুরে-ফিরে বারবার উল্লেখ করেছেন, যেমন- *অপুষ্টিতে ভোগে, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের চাপে ভোগে, পড়াশোনার চাপ নিয়ে ভুগছে প্রভৃতি)* হিসেবে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গীয় অসমতার কথা উল্লেখ করলেও একইসঙ্গে যখন কিনা এ 'রোগ/অসুস্থতা'র সাথে নারী সম্পর্কে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সসমূহকে (যেমন-*মেয়েদের মানসিক সহ্য ক্ষমতা কম, তাদের প্রকাশ ক্ষমতা কম, মেয়েরা চাপ নিতে পারেনা, তারা কোমলমতি, মেয়েদের মন দুর্বল প্রভৃতি)* জুড়ে দিয়ে এ 'রোগ/অসুস্থতা'য় নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে ধারণায়ন করেন তখন আদতে এই 'রোগ/অসুস্থতা'কে একটা লিঙ্গীয় চেহারা প্রদান করা হয় যার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সমাজে নারী সম্পর্কে প্রচলিত অধিপতিশীল লিঙ্গীয় মতাদর্শকেই উৎপাদন ও পুনুরুৎপাদন করা হয়।

এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট করেই বলা প্রযোজন যে, এখানে আমরা কোনমতে এমনটা বোঝাতে চাইছি না যে, সমাজে লিঙ্গীয় অসমতা/বৈষম্য নেই। আবশ্যিকভাবেই ঘরে-বাইরে তা বিদ্যমান - নানা চেহারায়, নানা মাত্রায়। 'সামাজিক কারণ'গুলোর (চিকিৎসকদের কর্তৃক চিহ্নিত) সাথে নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত হবার যুক্ততার বিষয়টিকে কোন কার্যকরী ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে উপস্থাপন করবেন তেমনটা আশা না করলেও যখন কিনা 'সামাজিক কারণ' (খোদ চিকিৎসকদেরই ভাষ্যমতে) এ উদ্ভূত একটি 'রোগ/অসুস্থতা'য় নারীর অনেক বেশি আক্রান্ত হওয়াকে যখন নারীর সাপেক্ষে প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণগুলোকে (যেমন-'*মেয়েদের মানসিক সহ্য ক্ষমতা কম*', '*প্রকাশ ক্ষমতা কম*', '*চাপ নিতে পারেনা*', '*মেয়েরা কোমলমতি*', '*মেয়েদের মন দুর্বল*' *প্রভৃতি)* 'রোগ/অসুস্থতা'য় নারীর বেশী সংখ্যায় আক্রান্ত হবার অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে সামনে আনা হয় তখন এই 'রোগ/অসুস্থতা'য় নারীর অধিকহারে আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে প্রাকৃতিকীকরণ (Naturalisation) করা হয়। আবার, একইসাথে এ ধরনের প্রবণতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে 'ভিকটিম'কেই গতানুগতিকভাবে স্টেরিওটাইপপূর্বক তাকে/তাদেরকে নিজেদের দুরাবস্থার জন্য দোষারোপ করবার প্রবণতা (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩ : ১২৩-১২৫)। অধিপতিশীল শ্রেণী কর্তৃক নির্মিত মতাদর্শিক জ্ঞানের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ ধরনের জ্ঞান উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষজনের প্রান্তিকতার কারণগুলোকে তাদের-ই 'অন্তর্নির্হিত' (যা কিনা অধিপতিশীল শ্রেণী কর্তৃক নির্মিত) গুণগতমানের সাথে জুড়ে দেয়া যা অন্তত দুইভাবে সমস্যাজনক। প্রথমত, এর মাধ্যমে আধিপত্যের মতাদর্শিক চেহারাটাকে আড়ালে ঢেকে দেয়া হয় আর দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় আর কোনভাবেই বৈষম্য/অসমতাকে/ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গীয় আচার-অচরণ ও সংশ্লিষ্ট চর্চাসমূহকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে দেখবার মত জায়গা থাকে না।

আবার, হিস্টেরিয়া আর 'গণ হিস্টেরিয়া'য় মেয়েরা-ই সাধারণত বেশি আক্রান্ত হয় বলে চিকিৎসকরা যেমনটি বলে থাকেন তা আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মে প্রত্যক্ষও করেছি । কিন্তু, আমাদের পুরো কাজের প্রেক্ষাপটে অবস্থাদৃষ্টে এই 'সাধারণত' শব্দটাকে আমাদের কাছে সমস্যাজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা, এমনকি পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে হলেও আমাদের গবেষণা-মাঠকর্মে পুরুষের সংখ্যা যেমন একেবারেই নগণ্য নয় তেমনি তা আমাদের সম্মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে উত্থাপন করে আর- তা হল, *"যদি সে সময় এ পুরুষগুলো ওই পুরো ঘটনার অংশ না হয়ে অন্য কোন সময়ে একই ধরনের লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসকদের কাছে যেতেন তবে তাদেরকে কি হিস্টেরিয়ার রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হত কিনা?"*- যা কিনা আবার বৃহত্তর লিঙ্গীয় রাজনীতিকেই প্রতিনিধিত্ব করে আর তা হল সাধারণত নারীরাই আক্রান্ত হয় বলে যেসব কারণগুলোকে সামনে আনা হয় সেগুলো যখন ভীষণ রকমে লিঙ্গীয়/জেন্ডারড্ সুরে কথা বলে তখন এমনটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত চাপ নেবার মত সহ্য ক্ষমতা কেবলমাত্র পুরুষেরই আছে, নারীর নয় আর এমন প্রবণতার মাধ্যমে প্রকারান্তরে 'রোগ/অসুস্থতা'টি কে পরোক্ষভাবে 'নারীসুলভ' করবার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনার পরিসর থেকে ধীরে ধীরে পুরুষ দৃশ্যের অন্তরালে চলে যায়। হিস্টেরিয়া নামক 'রোগ/অসুস্থতা'র সাথে পুরুষকে জুড়ে দেখবার অনীহার অনেক বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে এর ঐতিহাসিক লিঙ্গীয় নির্মাণ যেখানে নারী আর হিস্টেরিয়াকে সমার্থক করে ফেলা হয় যার নমুনা একজন ফরাসী চিকিৎসক Auguste Fabre (1883) নামক এর ভাষ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি :

"...সব নারীই হিস্টেরিক্যাল/ হিস্টেরিয়াগ্রস্ত এবং সব নারী তাদের সাথে হিস্টেরিয়ার বীজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটি অসুস্থতারও আগে হিস্টেরিয়া হল একটি মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি/মেজাজ আর যা কিনা নারীর মেজাজ তৈরী করে সেটা প্রাথমিক হিস্টেরিয়া।" (Fabre in Showalter 1993:286-287)

আর, এই ধরনের বক্তব্য থেকে একটা বিষয় অন্তত খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আসলে এই 'রোগ/অসুস্থতা'র সাথে পুরুষকে জুড়ে দেখবার অনীহা/পুরুষকে অদৃশ্য করে দেবার প্রবণতা ঐতিহাসিক কাল থেকেই ভীষণ রকমভাবে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা কর্তৃক প্রভাবিত। কেননা, পুরুষের জন্য হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হবার বিষয়টি কোনভাবে 'পুরুষালীসুলভ' আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই মনে করা হয় যেহেতু এ 'রোগ/অসুস্থতা'র লিঙ্গীয় নির্মাণ প্রকারান্তরে পুরুষের লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানহানি ঘটায়। পুরো বিষয়টিকে Israel বর্ণনা করেন এভাবে:

"একজন পুরুষের জন্য হিস্টেরিয়া সংক্রান্ত ডায়াগনোসিস পরিগণিত হয় বাস্তবিক আঘাত, দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে; এক কথায় বলতে গেলে যা পুরুষত্বহীনতার সামিল। সে অনুসারে

একজন পুরুষ মানুষকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে 'আপনি তো হিস্টেরিয়াগ্রস্ত' এমনটা বলা প্রকারান্তরে বোঝায় যে 'আপনি তো পুরুষ নন'"। (Israel in Showalter 1993:289)

এরকম প্রবণতা স্থানীয় পর্যায়েও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন পুরুষ যখন তার আক্রান্ত হবার কারণকে ব্যাখ্যা করেন তখন তার নিজের আর অন্য পুরুষদের আক্রান্ত হবার কারণকে একইভাবে ব্যাখ্যা করেন না, যেমন- একজন পুরুষ নিজের 'অসুস্থ' হয়ে পড়াকে সেবাদানের মত কাজের সাথে যুক্ত থাকার একটা আকস্মিক ফলাফল হিসেবে অভিহিত করেন অথচ, তখন 'অসুস্থ' হয়ে পড়েছেন এমন অন্য পুরুষদের 'মেয়েলী' স্বভাবের আখ্যা দিয়ে সেটিকেই তাদের 'অসুস্থতা'র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও নিজেকে সেই শ্রেণীভুক্ত করে দেখতে রাজি নন। সম্পূর্ণ বিষয়টাকে তিনি তুলে ধরেন এভাবে:

"...হ্যাঁ, আমি দুইদিন অন্যদের সেবা করছি। পরে আমাদের ম্যাডাম পড়ার পরে আমি পড়ছি... তবে যে ছেলেগুলো পড়ছে তাদের খেয়াল করলে দেখা যায় তারা খেলাধুলা কম করে, ঘরের মধ্যেই থাকে, বেশী খেলে না মানে প্রায় মেয়েদের মতই ছোট্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকে, এই ছেলেগুলো এরকম মন খুলে কথা বলে না, সবার সাথে মেশে না আর এতে তাদের এই অসুখ হলে এবিলিটি কম থাকে সেটা রোধ করার। তারাই দেখা যায় এই রোগে পড়ছে..."

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অধিপতিশীল মতাদর্শ নারীকে যেভাবে দেখে এমনকি আক্রান্ত একজন পুরুষ আক্রান্ত অপর পুরুষের অসুস্থ হবার কারণগুলোকে নারীর সামাজিক অবস্থানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বলে রোগ/অসুস্থতার লিঙ্গীয় ব্যাখ্যা যখন তার মত করে দাঁড় করায় তাতে করে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, 'রোগ/অসুস্থতা'টাই অনেক বেশী 'মেয়েলী' যাতে পুরুষের আক্রান্ত হওয়াটাই একটা ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে, এই বিশেষ 'রোগ/অসুস্থতা' কে কেন্দ্র করে যখন নানা স্তর থেকে লিঙ্গীয় (gendered) জ্ঞান বারবার সমাজে প্রচলিত লিঙ্গীয় জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয় তখন তা সেটিকে আরো ভিন্নমাত্রার জোরালো অর্থময়তা দেয় আর তখনই নারী সম্পর্কে প্রচলিত অধিপতিশীল ডিসকোর্স আরো জোরদার হয়।

এভাবে, 'রোগ/অসুস্থতা'কেন্দ্রিক মতাদর্শিক-লিঙ্গীয় রাজনীতির প্রক্রিয়ায় হিস্টেরিয়াগ্রস্ত নারীর শরীরে 'নারীত্ব'র বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয় [অধিকতর সংখ্যায় নারীর আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে যেভাবে নারীর প্রচলিত সামাজিক ইমেজের সাথে জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়] আর তার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে শরীর পরিণত হয় গ্রাফিক ট্যাক্সটে; জেন্ডার বিষয়ক বিবৃতির আধারে পরিণত হয় শরীর - "...the woman's body

becomes a surface on which conventional constructions of femininity are exposed." (Bordo 2003: 176)

৫.১. 'রোগ/অসুস্থতা', সমাজ-সংস্কৃতি, লিঙ্গীয় সম্পর্ক: পারস্পরিক যোগাযোগের উপাখ্যান

কেনইবা নারী ব্যাপকহারে আক্রান্ত হয় এই সম্পর্কে সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের ভাবনা-চিন্তা এবং অসুস্থতা সময়কালীন রোগীর বয়ান থেকে আমরা এই 'রোগ/অসুস্থতা'র লিঙ্গীয় স্বরূপকে বুঝতে চেয়েছি। কারণ, আমরা মনে করি যে, 'রোগ/অসুস্থতা'কে কেন্দ্র করে নানা স্তরের মানুষজনের ভাবনা-চিন্তা এবং 'অসুস্থতা' সময়কালীন ব্যক্তির বয়ান একভাবে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটায়। এই চিন্তা-ভাবনার আলোকে আমরা এটাও মনে করি যে, সমকালীন পরিবর্তনশীল সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নারীর নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে পাঠ করা যেতে পারে এইসব বয়ান/বক্তব্যগুলোকে বিশ্লেষণের নিরীখে।

এখানে যে বিষয়টা স্পষ্ট করা জরুরী তাহল যে, যদি সংস্কৃতির কথা বলছি তাহলে সংস্কৃতি বলতে আসলে কি ব্যক্ত করতে চাইছি? সংস্কৃতি স্থবির কোন বিষয়কে নির্দেশ করেনা। এটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান এবং এর অর্থময়তা একইসাথে পরির্তনশীল এবং অসমাপ্ত। এজেন্সী ও ক্ষমতার বহুমাত্রিক রূপরেখার উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি-চর্চার বিষয়টি কাজ করে। তাহলে সংস্কৃতির পরিবর্তন/পরিবর্তনশীল সংস্কৃতিকে বুঝবার পন্থা কি হবে? উন্নয়ন, আধুনিকায়ন অথবা পুঁজিবাদ এর মত পূর্বনির্ধারক কিছু যুক্তির আলোকে সংস্কৃতির পরিবর্তনকে উন্মোচন করে দেখবার মধ্য দিয়ে-ই শুধু এই পরিবর্তনের সামগ্রিক পাঠ সম্ভব না। বরং, এ সবকিছু কিভাবে নানাবিধ পরিচিতি (নির্ভরতা ও সংকট মূলক) তথা খোদ বাস্তবতাকে/বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্বকে তৈরি করে সেগুলো পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে অর্থাৎ, পূর্বাপর সম্পর্কগুলোর গুণগত রদবদলে কিভাবে ভূমিকা রাখে সেই বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে (Ong 1987:3-4)। আমরা মনে করি যে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে সমকালীন পরিবর্তনশীল সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নারীর (বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালীন নারী) নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও নারীর ক্ষেত্রে চর্চিত বহুমাত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপটাকে এভাবে পাঠোদ্ধার করা যেতে পারে যার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় / সামাজিক পরিসরে নারীর অবস্থান, নারীকে কেন্দ্র করে সমাজের চর্চিত লিঙ্গীয় মতাদর্শকে বোঝা যেতে পারে।

অন্যদিকে, অসুস্থতা হল একটি সামাজিক বাস্তবতা। সামাজিক কাঠামোর সাথে অসুস্থতার ধরন সম্পর্কিত অর্থাৎ, জীবনযাত্রার মান, শ্রেণী, পেশা, লিঙ্গীয় পরিচয় প্রভৃতির সাথে সুস্থতা ও অসুস্থতার সাথে যোগাযোগ রয়েছে (Herzlich 1995:151)। হিস্টেরিয়া ও

'গণ হিস্টেরিয়া'র মত বিষয়গুলিকে এসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোকে পাঠ করা সম্ভবপর হলে এই 'রোগ/অসুস্থতা'র বহুমাত্রিকাকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখার চেষ্ট করা যেতে পারে।

৫.২. পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বয়ঃসন্ধিকালের নারী, পুরুষ : সীমা (Boundary), গতিশীলতা (Mobility), আর যৌনতা (Sexuality)'র উপর নজরদারি (Surveillance)

"...লাল মোবাইল দিতে হবে...লাল বউ দিতে হবে..."
"তরা আমার তেঁতুল গাছটা কাটলি ক্যান?... আমরা তো ওইখানে থাকতাম"
"তর ভাইরে সরা...আমি তরে নিয়া যামু"

উপরে অসুস্থতাকালীন সময়ে বয়ঃসন্ধিকালীন নারী,পুরুষের বর্ণিত 'প্রলাপ'গুলোর মধ্য দিয়ে মূলত সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের ধরনগুলোই প্রতিফলিত হয় । একজন মেয়ে অসুস্থতাকালীন সময়ে যখন প্রলাপে জ্বীনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে পাশে থাকা 'পাহারাদার' ভাইকে সরিয়ে দেয়ার কথা বলে, গৃহসীমার বাইরে তেঁতুল গাছ কাটার জন্য সবাইকে দোষারোপ করে তখন মায়ের নির্দেশে ভাইয়ের নজরদারিতে থাকা কিংবা, মেয়ে বলে যথাসম্ভব বাড়ীর সীমানার মধ্যে থাকবার বিষয়গুলো পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়। অর্থাৎ, তার বয়ান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর জীবনে, বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে যখন ঘরে-বাহিরে সর্বত্র তার উপর নজরদারির বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী কঠোর হয়ে আসতে শুরু করে তখন 'নৈতিক' অভিভাবকরূপে পরিগণিত পুরুষ প্রতিকৃতির (পিতা/ভাই) ভূমিকাকে তুলে ধরে (মেয়ে/বোনকে চোখে-চোখে রাখবে)।

মেয়েরা 'বড়' হয়ে গেলে পর আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের চলা-ফেরার সীমাগুলি সীমিত হয়ে আসতে থাকে নানা নির্দেশনার নিরীখে,যেমন-সঙ্গে অভিভাবক (বিশেষত পুরুষ) ছাড়া বাড়ী অর স্কুল ব্যতীত অযথা অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি না করা, অযথা লাফলাফি-খেলাধুলা না করা, ছেলেদের সাথে না মেশা প্রভৃতি। বয়ঃসন্ধিকাল চলাকালীন একজন ছেলে আর একজন মেয়ের গতিশীলতার মধ্যে পার্থক্য আছে যদিও এই সময়টাতে দুজনের উপরই তাগিদ থাকে 'ভালো ছেলে/মেয়ে' হয়ে গড়ে উঠবার। একজন সমবয়সী ছেলে যেখানে বাজারে, সিনেমা হলে যেতে পারছে কিংবা, খোলা মাঠে খেলাধুলা করতে পারছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐ বয়সী একজন মেয়ে তা পারছে না। চলমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকজন ছেলের কথা উল্লেখ করা যায় যে কিনা অসুস্থ থাকাকালীন অনবরত প্রলাপ বকত যেখানে সে বলত, "আমাকে লাল গাড়ি দিতে হবে, লাল মোবাইল দিতে হবে, লাল বউ দিতে হবে।" ১৫/১৬ বছরের একজন ছেলের

গতিশীলতার পরিধি সমবয়সী মেয়েটির তুলনায় অনেক বেশি হলেও প্রলাপে তার ''লাল বউ'' চাওয়ার বিষয়টি আবার এটাও প্রতীয়মান করে যে, সামাজিক অনুশাসনের নজরদারি পুরুষের উপরেও বিরাজমান (আবশ্যিকভাবেই তার মাত্রাগত ভিন্নতা বিদ্যমান) যাকে চাইলেই সে পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলতে পারে না, যার সাথে আবার তার অন্তর্গত কামনা-বাসনা'র টানাপোড়েন কাজ করে। সামগ্রিকভাবে বয়ানগুলো আমাদের দেখায় যে, এ সমাজে নারীর 'নৈতিক' অভিভাবক হিসেবে পরিবারের পুরুষ সদস্যের বৈধতা, আধিপত্য তাকে নারীর জীবনে নজরদারিত্ব চালাবার মত অধিকার প্রদান করে, নারীর গতিশীলতার পরিধিকে সীমায়িত করবার ক্ষমতা প্রদান করে। অন্যদিকে, এ বয়ানগুলো আরো দেখায় যে, নারী, পুরুষের যৌনতাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে দেখা হয় ; পুরুষ যত সরাসরি তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে নারীকে তা ব্যক্ত করতে হয় অন্যের কণ্ঠস্বর (জ্বীনের) ধরে।

আবার, একজন হুজুর বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে-মেয়েদের, বিশেষভাবে অধিকহারে নারীদের অসুস্থতায় আক্রান্ত হবার কারণকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ''আল্লাহর কালাম মেনে না চলার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে অভিভাবকদেরকে হেদায়েত করবার ফলাফল'' হিসবে দেখেন তাতে তিনি মূলত অন্তর্নিহিতভাবে নারীর সীমা (boundary) কতদূর হতে পারে/হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তার এক ধরনের ইঙ্গিত তার বক্তব্যে পরোক্ষভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, একজন নারী অভিভাবক স্কুলের মেয়েদের অধিক হারে এই 'রোগ/অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হবার ঘটনাটিকে দেখেছেন দেশে নারী শিক্ষা ধ্বংসের 'মৌলবাদী' চক্রান্ত হিসেবে। নিখাঁদ ধর্মীয় ব্যাখ্যা কিংবা, 'মৌলবাদী' তৎপরতা যে দিক থেকেই দেখা হউক না কেন এসব বক্তব্য অন্তর্নির্হিতভাবে নির্দেশ করে পরিবর্তনশীল এই সমাজে নারীর সীমা/গতিবিধিকে কিভাবে ধারণায়ন করা হয়। দু'ধরনের ব্যাখ্যা থেকেই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নিয়ন্ত্রণের/নজরদারির আওতায় রাখবার মূল বিষয় হচ্ছে নারীর শরীর।

৫.৩. বিদ্যালয়ঃ পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষিতে খতিয়ে দেখা

''ওইসব প্রতিষ্ঠানে তো আমাদের চাইতেও বেশি চাপ দেয়া হয় তাহলে সেখানে পড়ে না কেন?''

স্কুলের পড়াশোনার চাপকে 'গণ হিস্টেরিয়া'র কারণ ব্যাখ্যায় 'সামাজিক চাপ' এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন চিকিৎসকেরা। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষভাবে অধ্যক্ষ (তিনি একাধারে স্কুল ও কলেজের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনরত বিধায় সবাই তাকে প্রিন্সিপাল/অধ্যক্ষ বলেই সম্বোধন করে থাকে) কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপর পড়াশোনার জন্য অত্যধিক চাপ দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়টি অভিযোগ আকারে অভিভাবক, শিক্ষার্থী এমনকি খোদ শিক্ষকদের

মধ্যে অনেকের কাছ থেকেও বারবার শুনেছি। সেই প্রেক্ষিতে আমরা স্কুল এর নিয়ম-শৃঙ্খলা, নজরদারি ও পড়াশোনার চাপ এই বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখতে আগ্রহী।

স্কুল শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জনের ক্ষেত্র না। সমাজ-সংস্কৃতি নির্দিষ্ট 'ভালো ছেলে', 'ভালো মেয়ে' গড়ে তোলার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যখন স্কুলের উপর বর্তায় তখন স্কুল একই সাথে লিঙ্গীয় মতাদর্শকে উৎপাদন এবং পুনুরুৎপাদন করবার ক্ষেত্রও বটে। শিক্ষা যদি হয়ে থাকে আধুনিকায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তবে স্কুল হল আধুনিকতার প্রতীক যা আবার একইসাথে সামাজিক বাউন্ডারিগুলোকেও মেনে চলে। স্কুল একভাবে 'ভালো ছেলে', 'ভালো মেয়ে' গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কৃতি নির্দিষ্ট এক ধরনের মতাদর্শকে চর্চা করে। বড় হবার পর একজন মেয়েকে পরিবার থেকে 'ভালো মেয়ে' হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য যেমন নানা নজরদারি কাজ করে স্কুলেও অনুরূপ নজরদারির ব্যবস্থা নানা কৌশলে জারি রাখা হয়,যেমন- ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা-আলাদা বসবার ব্যবস্থা, ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার উপর পরোক্ষভাবে নজরদারি করা প্রভৃতি। Foucault বলেন যে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষজনকে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা হয়, শৃঙ্খলিত করা হয়। Foucault'র বক্তব্য অনুযায়ী এগোলে, এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি প্রতিষ্ঠানে নজরদারির ধরন বহুমুখী হতে পারে। নরসিংদীর স্কুলটিকেই যদি একটি নমুনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়ে এগোই তবে কে কার সাথে মিশবে; ক্লাসে কে কিভাবে,কোথায় বসবে এর সবকিছুই স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নজরদারির আওতায় থাকে। এমনকি মেধার মত বিমূর্ত বিষয়টির উপরও প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি কায়েম করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী পর্যন্ত শিক্ষকদের সশরীরে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নতুন কিছু নয়। কিন্তু, অন্তত নরসিংদীর প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে, বিগত কয়েক বছরে এই নজরদারির প্রক্রিয়া আরো সুসংগঠিত হয়েছে, কঠোর হয়েছে, যেমন- অধ্যক্ষ সপ্তাহের শুরুতেই পুরো সপ্তাহের জন্য একটা দৈনিক পাঠ্যক্রমকে নির্ধারণ করে তার তদারকি করছেন। বিশেষত ভালো ফলাফলধারী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে দৈনিক ভিত্তিতে এই নজরদারি আরো বেশি করে নিশ্চিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে তদারকিকে আরো নিচ্ছিদ্র করতে শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে আকস্মিক পরিদর্শনে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন খোদ অধ্যক্ষ । এ থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হল যে, আধুনিক পুঁজিবাদী বাজার সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশে বিগত এক দশকে যে যে ব্যাপক পরিসরে মোবাইল ফোনের সম্প্রসারন ঘটেছে তাতে করে যন্ত্র খোদ নজরদারির একটি নতুন মাধ্যম হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

কিন্তু, অধ্যক্ষ কেন এমন নজরদারি ও চাপ তৈরি করেন সেটিও খতিয়ে দেখবার বিষয়। তিনি এমনটি করেন কারণ, স্কুলের সার্বিক ভালো ফলাফল নিশ্চিত করাটাই তার প্রধানতম দায়িত্ব। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসাটাকে তিনি তার দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু যখন কিনা 'পড়াশোনার চাপ'কে এই 'রোগ/অসুস্থতা'র জন্য দায়ী করা হয় সেখানে তিনি প্রত্যুত্তরে আঙ্গুল তোলেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে, বলেন- "*ওইসব প্রতিষ্ঠানে তো আমাদের চাইতেও বেশি চাপ দেয়া হয় তাহলে সেখানে পড়ে না কেন?*" - তার এই প্রশ্ন আদতে আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই আঙ্গুল তোলে যেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো/মন্দ হিসেবে পরিচিত হবার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হল নির্দিষ্ট স্কুলটি থেকে ভালো ফলাফল করবার পরিসংখ্যানগত হিসেব-নিকেশ। আবার এই হিসেব-নিকেশের উপর অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি/অপ্রাপ্তির বিষয়টি যা আবার শিক্ষা বিষয়ক ইস্যুতে নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত, যেমন-এম.পি.ও, উপবৃত্তি প্রকল্প প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, আদিয়াবাদ হাইস্কুল অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলের একটি অন্যতম ভালো স্কুল হিসেবে পরিচিত। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের দাবিমতে, ২০০২-২০০৩ সালে পাশের হার ১৬% এ নেমে আসে। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ায় ২০০৫ এ পাশের হার ৫১%, ২০০৬ এ ৯৩% এবং ২০০৭ এ ৮২% এ উন্নীত হয়। স্থানীয় মানুষজনের সাথে আমাদের আলাপচারিতায় সুনির্দিষ্টভাবে পাশের হার না জানা গেলেও ফলাফল উন্নীতকরণের সত্যতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

উল্লেখ্য, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো ফলাফল আবার ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক ধরনের পুঁজিতে পরিণত হয়। এর 'ভালো' ফলাফলের উচ্চহার নিশ্চিত করবার প্রচেষ্টার সাথে আবার শিক্ষার্থীর পরবর্তী শিক্ষাজীবন যুক্ত যেহেতু খ্যাতনামা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য আসন সংখ্যা সীমিত। একটা 'ভালো' ফলাফলের সাথে এমনকি 'ভালো' ভবিষ্যৎ, 'ভালো' চাকুরি, 'ভালো' বিয়ের মত বিষয়গুলো সম্পর্কিত। তবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, 'ভালো' ফলাফলের জন্য 'চাপ' এর অর্থ আবার নানাবিধ যা কিনা একদিকে ক্লাসের 'প্রথম সারির শিক্ষার্থী' আর 'শেষ সারির শিক্ষার্থী'দের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন টানা-পোড়েন তৈরি করে; অন্যদিকে, অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা শিক্ষর্থীদের জন্য টানা-পোড়েনের মাত্রাগত অর্থ আবার ভিন্ন রকমের হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'প্রথম সারির শিক্ষার্থী' আর 'শেষ সারির শিক্ষার্থী'দের (নম্বরের ভিত্তিতে 'ভালো' / 'খারাপ' ফলাফল বিবেচনা সাপেক্ষ যাদের কিনা চলতি কথায় 'ভালো' আর 'খারাপ' ছাত্র/ছাত্রী বলে অভিহিত করা হয়) মধ্যে যারা 'শেষ সারির শিক্ষার্থী'/ 'খারাপ শিক্ষার্থী' বলে পরিচিত তারা তাদের ক্ষেত্রে এহেন পরিচিতির কারণে তাদের অবচেতনে খারাপ লাগার অনুভূতি থেকে আরো হীনমন্যতায় পতিত হয়।

অন্যদিকে, 'প্রথম সারির শিক্ষার্থী' / 'ভালো' শিক্ষার্থী'দের জন্য 'চাপ' এর কারণ হয় তাদের 'ভালো' ফলাফলকে বজায় রাখবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'অতি-আনুষ্ঠানিক' মনোযোগ প্রদর্শনের বিষয়টি। অন্যদিকে,'ভালো' ফলাফলের জন্য কোচিং/প্রাইভেট টিউশনে পড়ার খাতিরে দরিদ্র পরিবারের অনেককে টিউশনি করে সেই খরচ যোগাতে হয়। নিদেনপক্ষে কোচিং/প্রাইভেট টিউশনে পড়ার জন্য খরচটা অভিভাবক দিলেও তাদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচের 'চাপ'টা যাতে অভিভাবকের উপর না পড়ে সে কারণেও তাদের অনেকে টিউশনি করছে। তাহলে, 'পড়াশোনার চাপ সংক্রান্ত তত্ত্ব'কে প্রতিরোধ করে প্রিন্সিপ্যাল যে প্রশ্ন তোলেন সেখান থেকে উত্তর খোঁজার প্রয়াসে আমরা দেখতে পাই যে, খোদ এই একটা 'চাপ' এর চেহারা কত বহুমাত্রিক এবং তা আবার একেকটি পর্যায়ে অন্য আরো অনেকগুলো সাবজেকশনের সাথে যুক্ত; কখনো কখনো একটি আরেকটিকে অতিক্রম করে যায় (overlap), কখনো কখনো একটি আরেকটিকে পরস্পরছেদ করে (intersect) যা আবার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বসবাসরত মানুষজনের উপর গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে।

৫.৪. পরিবর্তনশীল সমাজ-সংস্কৃতির আবহে নারী: অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ

"আমার মতে, ২০ এর নীচে কোন মেয়েকে বিয়ে দেয়া উচিৎ না..."

সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসছে কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতার আবহ নারীর জীবনকে নানা আঙ্গিকে প্রভাবিত করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে আর সে কারণে ভবিষ্যত নিয়ে নারীর নিজের মধ্যে এক ধরনের হিসাব-নিকাশ সমকালীন প্রেক্ষাপটে কাজ করে। কিন্তু, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দেহকে যেভাবে বয়সের সাথে জুড়ে বিবেচনা করা হয় সেখানে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর নারীর বিয়ে ও শিক্ষা/কর্মজীবন নিয়ে একধরনের টানা-পোড়েন তৈরি হয়। অসুস্থতার প্রেক্ষিতে আমরা এই বাস্তবতার নানা আঙ্গিককে মূলত এই অংশে ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছি যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংস্কৃতির পরিসরে নারীর বয়স সংক্রান্ত ইস্যু নারীর জন্য একটা অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ তৈরি করে ।

নরসিংদীর প্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে, পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নারীর জন্য অন্তত এস.এস.সি পাশ করাটাকে একটা 'আদর্শমান' বলে বিবেচনা করা হচ্ছে; অনেক নারীকে কলেজে পড়ার জন্য নরসিংদী সদর এমনকি ঢাকা পর্যন্ত আসবার সুযোগ পরিবার তৈরি করে দিচ্ছে। কিন্তু নারী এই শিক্ষা অর্জন করবার প্রক্রিয়ায় তার স্বপ্ন, লক্ষ্যকে (যেমন- ডাক্তার/আর্মি/শিক্ষক হওয়া/মোটর সাইকেলে চড়া) শেষ পর্যন্ত বাস্তব রূপ দিতে পারবে কিনা তা নিয়ে নারীকে একটা দোদুল্যমান অবস্থানে থাকতে হয়। কারণ, পরিবার থেকে না হলেও সমাজ থেকে বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে এক ধরনের তাগিদ কাজ করে। অনেকের সাথে এ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা এই বিষয়টি কে

উঠে আসতে দেখি। কিন্তু'অসুস্থতা' র পরিপ্রেক্ষিতে কারো কারো ক্ষেত্রে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা দেখতে পাওয়া যায়। একজন মেয়ের এরূপ অসুস্থতার কারণে পাড়া-প্রতিবেশীরা বিয়ের তাগিদ দেয়া বন্ধ করে দেয় যার কারণে সেই মেয়ের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চ শিক্ষা অর্জনের দিকে বাড়তে সুবিধা হয়, ঢাকাতে আসবার সুযোগ তৈরি হয়, যদি তার অসুস্থতাকে আমরা প্রতিরোধ হিসেবে দেখি। অন্যদিকে, আরেকজন মেয়ের পুনঃ পুনঃ অসুস্থতার কারণে পাড়া -প্রতিবেশীর বিয়ে-শাদীর তাগিদ দেয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় যেখানে সেই মেয়ের অসুস্থতার প্রসঙ্গকে পরবর্তীতে তার বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে তুলে ধরে তার মাকে নানা ধরনের কথা বলা হয় যার ফলশ্রুতিতে ওই মেয়েটির মাকে পাড়া -প্রতিবেশীর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়।

একজন মেয়ে স্বপ্ন দেখে সে ভালো ব্যাংকার হবে; তো আরেকজনের স্বপ্ন সে চাকরি (ব্যাংকে/বড় কোন কোম্পানীতে) করে তারপর ভালো কোন ছেলেকে বিয়ে করবে; অন্যজনের আকাঙ্ক্ষা হল সে আর্মিতে চাকরি করবে, মটর সাইকেল চালাবে, বাবা-মাকে সাহায্য করবে; অপর আরেকজন মেয়ে স্বপ্ন দেখে যে সে একজন শিক্ষিকা হবে। কিন্তু যতজন মেয়ের মায়ের সাথে কথা হয়েছে তারা মেয়ের শিক্ষার্জন করবার উপর জোরারোপ করলেও বিয়ের বিষযটিকে-ই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আঞ্চলিকভাবে নরসিংদীর আদিয়াবাদে বিগত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে নারীশিক্ষার প্রচলন আছে বলে উল্লেখ করবার পাশাপাশি কেউ কেউ নিজেদের বাড়ীর (মিঞা বাড়ী, মৌলভী বাড়ী, ভূঞাঁ বাড়ী প্রভৃতি) ঐতিহ্যকেও নারীশিক্ষার জন্য প্রেরণাদায়ক হিসেবে অবিহিত করে স্বীয় কন্যাকে অপরাপর উচ্চশিক্ষিতা আত্মীয় রমণীর মত উচ্চশিক্ষিতা করবার স্বপ্ন লালন করেন। মেয়ের শিক্ষার্জনের উপর জোরারোপ করলেও ভালো পাত্র আর মেয়ের বয়সের হিসাব করে যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সেটা তাদের সাথে আলাপচারিতায় উঠে আসে। একজন মা বিষয়টি অনেক সরাসরি বললেও আরেকজন মা বলেন, ''*আমার মতে, ২০ এর নীচে কোন মেয়েকে বিয়ে দেয়া উচিৎ না।*'' শেষোক্ত মায়ের এধরনের মূল্যায়ন প্রকারান্তরে নির্দেশ করে যে, ২০ বছর এর পর কোন মেয়েকে বিয়ে দেয়ার চিন্তা করাটা অভিভাবকের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবার মত কোন বিষয়ও না।

আধুনিক শিক্ষার আবহ নারীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বৈশ্বিক উন্নয়নের মডেলে নারীশিক্ষাকে উন্নয়নের চলক হিসেবে গণ্য করায় সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে উপবৃত্তি চালু করেছে, অনেকগুলো পর্যায়ে নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। সারাসরি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারনে নারী তার পরিবারর গন্ডী অতিক্রম করে একটা বিশাল সংখ্যায় যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন স্কুলের আধুনিক শিক্ষা তার মনে নানা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিচ্ছে। নিদেনপক্ষে ''জীবনের লক্ষ্য কি?'' এই প্রশ্নর উত্থাপন করবার মধ্য দিয়ে কোন না

কোন স্বপ্ন তাদের অবচেতন মনে তৈরি হচ্ছে। যে নারীকে তার পরিবার স্কুলে পাঠাচ্ছে তার ফলাফল করবার ধারা ভালো/মোটামুটি মানের হলে পরিবার তার কাছে শেষ পর্যায়ে ভালো ফলাফলটাই সব সময় আশা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টা হয়তো নারীকে এক ধরনের টানা-পোড়েনের মধ্যে রাখে। মোবাইল ফোনের বদৌলতে নারীর উপর স্কুলের তদারকি ঘর পর্যন্ত আরো পাকাপোক্ত হয়। ঘরে-বাহিরে নারী শিক্ষার উপর এত তদারকি সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী তর জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অনিশ্চিত বাস্তবতায় বসবাস করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। পড়ালেখা করে সে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, লক্ষ্য অর্জন করবার আগে তার বিয়েও হয়ে যেতে পারে।

শুধুমাত্র তো আধুনিক শিক্ষা নয় বরং, আধুনিক বাজার, মিডিয়া- এসবকিছুও নারীর মধ্যে নানা সাধ, আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিচ্ছে। আধুনিক বাজার হাতের কাছে চলে আসার পাশাপাশি মিডিয়ার কল্যানে নারীর সাধ কেবলমাত্র পণ্যটুকু ক্রয় করে ব্যবহার করবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং, মিডিয়ায় পরিবেশিত নারীর আদলে নিজেকে উপস্থাপন করবার আকাঙ্ক্ষা/স্বপ্ন অবচেতনে কাজ করে। দরিদ্র পরিবারের অনেক মেয়ে ১৪-১৫ বছর থেকেই মেয়ে ঘরে বসে টিউশনি করে নিজেদের উপার্জিত টাকা নিজেদের শখ পূরণ করতে খরচ করে, কখনো বাবা-মাকে সাহায্য করে। স্বপ্নের ক্যানভাসটা তাদের অনেক বড় এরকম বলবার মধ্য দিয়ে কোনভাবেই তাদের স্বপ্ন, স্বপ্নের ক্যানভাসটাকে রোমান্টিসাইজ করবার বাসনা/তাগিদ এই লেখার উপজীব্য বিষয় না। যা উপলব্ধি করাটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তা হল এই যে, স্বপ্ন/ স্বপ্নের ক্যানভাসটা যত বড় স্বপ্ন পূরণের প্রতিকূলতাও তত বড়।

৫.৬. 'সেকেন্ডারি গেইন' : প্রাপ্তিযোগের একটি লিঙ্গায়িত বিশ্লেষণ

"তুমি আরো বড় হলে পর তোমাকে মোবাইল কিনে দেয়া হবে..."

চিকিৎসকেরা 'গণ হিস্টেরিয়া'র কারণ হিসেবে 'সেকেন্ডারি গেইন' অর্জন করবার প্রবণতাকেও একভাবে দায়ী করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা মতে, এ ধরনের 'রোগ/অসুস্থতা'কে আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক সময় 'সেকেন্ডারি গেইন' অর্জন করতে ব্যবহার করতে পারে। চিকিৎসকরা যাকে বলছেন 'সেকেন্ডারি গেইন' আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে হয়তো সেটা-ই একভাবে 'প্রাইমারি গেইন'। গেইন/প্রাপ্তির বিষয়টিকে প্রেক্ষিতকরণ করে পাঠ করলে এই বাস্তবতা ধরা পড়ে যেখান থেকে বিষয়টি কেবল আর 'মুখ্য ও গৌণপ্রাপ্তি'র ধারণায় অটকে থাকে না; বরং, প্রাপ্তির বিষয়টি 'মুখ্য/গৌণ' যাই হউক না কেন তার মধ্য দিয়ে কে কি চায়, কেন চায় আর কে কি পায়, কেন পায় সেই বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যার দিকে এগুনো যায়। 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হবার মধ্য দিয়ে মোবাইল ফোনের জন্য দাবি করা/তোলা - এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা এখন এ সংক্রান্ত ইস্যুতে একটি বিশ্লেষণকে সামনে আনব।

পণ্য, আধুনিকতার নানা উপাদান, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক মিডিয়া নারী এবং পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন তৈরি করে। কিন্তু বাস্তবতা হল যে, সেই চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, পণ্য যাই বলি না কেন তার প্রাপ্তিযোগ এর ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় বৈষম্যের বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। যেমন বলা যায় যে, শ্রেণী নির্বিশেষে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মোবাইল ফোন দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শ্রেণী নির্বিশেষে এই মোবাইলের প্রাপ্তিযোগের ক্ষেত্রে পরিবার একজন পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় আনে/পূরণ করে (নতুন/পুরানো মোবাইল সেট কিনে দেবার মাধ্যমে)। পুরুষ এমনকি তার সামাজিক গতিশীলতার পরিসরকে জোরারোপপূর্বক মোবাইল ফোন পাবার জন্য চাপও প্রয়োগ করতে পারে/ বয়ঃসন্ধির একজন পুরুষের সামাজিক গতিশীলতার পরিসরকে মাথায় রেখে পরিবার থেকে মোবাইল ফোন কিনে দেয়াটাকে ক্ষেত্র বিশেষে জরুরী বলে মনেও করা হয় নজরদারি চালু রাখবার সুবিধার্থে। অন্যদিকে, নারীর এ সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা কে বিবেচনায়ও আনা হয় না। মোবাইল ফোনের সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে শ্রেণী নির্বিশেষে সমবয়সী নারীকে (বয়ঃসন্ধির একজন সমবয়সী পুরুষের সাপেক্ষে) নির্ভর করতে হয় পরিবারের বয়স্ক নারীর উপর (মা), বাবা/ভাই এর উপর যারা আবার তার গতিশীলতা,জীবন-যাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে চোখে-চোখে রাখে। একাধিক ছেলে যেমন নিজের একটি আলাদা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে/ 'অসুস্থতা'র সময় প্রলাপে পুরাতন মোবইল সেটের বদলে নতুন মোবাইল সেট দাবি করতে পারছে সেখানে সমবয়সী একজন মেয়ে 'অসুস্থতা'র পর তার জন্য কানের দুল আর মোবাইল ফোন চাইলে তাকে কানের দুল কিনে দেবার আশ্বাস দেয়া হলেও মোবাইল ফোনের ব্যাপারে তাকে নিষেধ করা হয় এই বলে যে, আরো বড় হলে পর তাকে মোবাইল ফোন কিনে দেয়া হবে। এই বয়সী ছেলে-মেয়েদের হাতে মোবাইল দেয়া/না দেয়া'র বিষয়টি নয় বরং বরং মোবাইল ফোনের উদাহরণ থেকে আমরা যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখছি তা হল যে, সমাজে পরিবর্তন আসছে যার সাথে যোগসূত্রতা রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত সুবিধালাভের ধারণার । কিন্তু, এটাও পরিষ্কার যে, এই সুযোগ-সুবিধা নারী,পুরুষ সব সময় সমানভাবে পাচ্ছে না যা নতুন ধরনের জটিলতা তৈরি করে।

৫.৭. প্রতিরোধঃ অধঃস্তনতার বহুমাত্রিক চেহারা

"...মেয়েরাই তো কত চাপ সহ্য করে বাচ্চার জন্ম দেয়..."

সমাজের 'দুর্বল' শ্রেণীর মানুষজন তাদের ক্ষেত্রে চর্চিত ক্ষমতা-সম্পর্ককে নানাভাবে প্রতিরোধ করে - ছোট,ছোট কর্মকান্ডে; ছোট-খাটো প্রশ্নে; আবার কখনোবা সমাজে বিদ্যমান 'স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা'র মধ্যকার সীমারেখাকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে। এই প্রতিরোধ বিদ্যমান সব ধরনের ক্ষমতা সম্পর্ককে ভেঙ্গে-চুরে দেয় না কিন্তু, ক্ষমতা

সম্পর্কের স্বরূপকে প্রকৃতার্থে অনুধাবন করতে হলে প্রতিরোধকে এভাবে, এই আঙ্গিকে দেখতে পাওয়াটা জরুরি (Scott 1985; Lughod 1991)।

বিদ্যালয়ে সকালের সমাবেশ না করবার জন্য 'অসুস্থতার অভিনয়' করবার সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন 'অসুস্থতা'র ঘটনাগুলো সম্পর্কিত ছিল যার সবটাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেও এ নিয়ে কোন বড় রকমের বিরোধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জড়ায়নি/এড়িয়ে গেছে। কিন্তু, পরবর্তীতে অসুস্থতার ঘটনা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়লে এবং তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকালের সমাবেশ সাময়িক সময়ের জন্য বাতিল করে। আরেকজন ছাত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তার খাতা টেনে নিয়ে যাওয়ার কারণে অসুস্থতার সময় প্রলাপে একজন শিক্ষককে সে মারতে চায় তার 'অপমানবোধ' থেকে; অপর একজন প্রলাপে অধ্যক্ষকে বলে, ''ফাইজলামি করেন?'' এগুলো সবই অধঃস্তন শ্রেণীতে প্রতিরোধের বিভিন্ন ধরন।

আগেই বলেছি যে, সামাজিকভাবে নারী একটা 'অনিশ্চিত' বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করে। তবে পরিষ্কার করা দরকার যে, এই অনিশ্চিত বাস্তবতার মধ্যে বসবাসকারী নারী কোন 'নিষ্ক্রিয় সত্ত্বা' না। এ যাবৎ এই প্রবন্ধের পরিসরে সমাজে নারীর বিভিন্ন প্রান্তিকতা ও প্রান্তিকীকরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, পরিবর্তনশীল সমাজে নারীর সীমাকে যেভাবে ধারণায়ন করা হয় আলোচিত হয়েছে। যা হউক, সামাজিক সীমা যেমন নারীর ক্ষেত্রে আছে তেমনি এটাও সত্য যে, নারী সেই সীমাকে তার মত করে অতিক্রমও করে; প্রশ্ন করে আর প্রশ্ন করবার আদলে প্রতিরোধও করে আর এই প্রতিরোধকে খুঁজে বের করতে হয় তার নানা কর্মকান্ড, আচরণকে পাঠ করবার মধ্য দিয়ে ।

এক্ষেত্রে, ''মৌলভী বাড়ীর মেয়ে'' হিসেবে একজন মেয়ের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ,গান, অভিনয় প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করাটাকে সামাজিকভাবে সমীচীন না বলে মনে করা হলেও সে স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনয় করে। ''মৌলভী বাড়ীর মেয়ে'' বলে ছেলেদের সাথে কথা বলা যাবে না এমনটা শুনে বড় হলেও, আমাদেরকে বললেও আমাদের সামনেই 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত আরেকজন মেয়েকে দেখি তার মাকে উপস্থিত রেখে ছেলেদের সাথে কথা বলতে । আবার, অন্য একজন মেয়ের ক্ষেত্রে দেখি যে, অভিভাবকের ইচ্ছায় মাদ্রাসায় না পড়ে বরং সেখান থেকে চলে এসে হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ায় যেখানে এক ধরনের টানাপোড়েন চলছিল সেখানে অসুস্থ হবার পর অভিভাবকের তরফ থেকে তুলনামূলকভাবে শিথিল আচরণ পাবার কারণে জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন করে ডাক্তারের বদলে 'আর্মি'হবার সম্ভাবনাকে বাস্তব করবার জন্য অন্তত সাময়িকভাবে হলেও একটা অনুকূল পরিবেশ পায়।

অন্যদিকে, আমরা নরসিংদীতে যখন আক্রান্ত মেয়েদের তাদের 'রোগ/অসুস্থতা'র কারণ জিজ্ঞসা করেছি তখন তারা যেমন বলেছে *"জানি না"/"বলতে পারি না"/"বলতে পারব না"* তেমনি এই 'রোগ/অসুস্থতা'র সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞ/চিকিৎসকেরা আবার যেসব 'সামাজিক কারণ'কে (যেগুলো আবার ভীষণ রকম লিঙ্গীয়) নারীদের ব্যাপকহারে আক্রান্ত হবার জন্য চিহ্নিত করেন সেগুলো নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলেন। যেমন - উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশেষজ্ঞ/চিকিৎসকেরা যখন বলেন, *"মেয়েরা মানসিকভাবে দুর্বল,বেশী চাপ সহ্য করা ক্ষমতা কম/চাপ সহ্য করতে পারে না বলে বেশী আক্রান্ত হয়েছে "*- তখন সেরকম বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে তারা প্রশ্ন তোলেন *"মেয়েরা চাপ সহ্য করতে পারে না / চাপ সহ্য করার ক্ষমতা কম বলে মানা যায় না। মেয়েরাই তো কত চাপ সহ্য করে বাচ্চার জন্ম দেয়..."*

পড়াশোনার বাড়তি চাপের জন্য বিদ্যালয়কে 'অসুস্থতার ক্ষেত্র' হিসেবে চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করলেও 'অসুস্থতা'য় আক্রান্ত মেয়েরা কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করে। মেয়েদের জন্য বিনোদনের বাউন্ডারি/সীমাগুলো বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ক্রমাগতভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে আসার কারণে তারা বিদ্যালয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থাকে 'চাপের কারণ' বলে মনে করলেও সেটিকেই বিবেচনা করে তাদের সবচেয়ে বড় বিনোদনস্থল হিসেবে।

এসব বয়ান/আচরণ/চর্চা বয়ঃসন্ধিকালীন সময়কার পুরুষের পাশাপাশি বিশেষ করে নারীর উপর চর্চিত ক্ষমতার নানা ধরনকে সামনে আনে যা কখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আদলে/ কখনো রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদলে/ কখনো মতাদর্শের আদলে হয়ে থাকে। আর, এসব কিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে কখনো তাদের খন্ড-খন্ড আচার-আচরণে/চর্চায় আর কখনো এই ধরনের বিশেষ 'অসুস্থতা'র সময় সুনির্দিষ্টভাবে তাদের প্রলাপের মধ্য দিয়ে। নারী, পুরুষ ভেদে কারো লাল মোবাইল চাওয়া/বড় বোনদের মারতে চাওয়া/ বোনের দিকে স্যান্ডেল ছুঁড়ে মারা, কারো বেড়ানোর/বিনোদনের জায়গা চাওয়া/ভাইয়ের নজরদারি থেকে রেহাই চাওয়া, কারো শিক্ষককে মারতে চাওয়া/তিরস্কার করা প্রভৃতির মত বিষয়গুলো ব্যক্তিভেদে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চাহিদা তৈরি হওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে চলার জন্য তাদের ভিতরকার আকাঙ্ক্ষা,অভাববোধ /ক্ষোভ / পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কঠোর নজরদারি / স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সম্পর্ক চর্চার বিষয়সমূহকে অতিক্রম করতে চাওয়ার মত অনুভূতিগুলোকে জানান দেবার প্রক্রিয়ায় আদতে নানা ধরনের অধস্তনতা/প্রান্তিকতা কে নির্দেশ করে, ক্ষমতার বহুমাত্রিক কাঠামোকে নির্দেশ করে।

৫.৮. 'রোগ/অসুস্থতা' পরবর্তী সময়কালে 'রোগ/অসুস্থতা' কেন্দ্রিক নতুন টানাপোড়েন

"...(নাম) কেতো কিছু বলাই যাবে না, বললেই তো আবার....."

"আজকে অসুস্থ হইলে পর তুমার সেবা কে করব? "

"তুই তো আগে এরকম ছিলি না... এই অসুখের পর এমনটা হইছিস "

'রোগ/অসুস্থতা'কে কেন্দ্র করে আক্রান্ত শিক্ষার্থী ঘরে-বাহিরে নতুন কতকগুলো টানা-পোড়েনের মুখোমুখি হয় (যেমন- বাবা-মায়ের সঙ্গে,বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে) যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চিকিৎসকের প্রেসক্রাইবকৃত 'চাপ' না দেওয়ার বিষয়টিই কারো কারো ক্ষেত্রে 'চাপ' এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'রোগ' কে কেন্দ্র করে প্রাথমিক পরিস্থিতি সামলে নেবার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের 'সচেতনতা', অবহেলা, উপেক্ষা, হাসি-ঠাট্টা/তামাশা ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর 'প্রান্তিকতা'য় কোন না কোনভাবে প্রভাব ফেলে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর 'প্রান্তিক' হয়ে পড়বার ক্ষেত্রে সহপাঠীদের আচরণ, কথা-বার্তাও ভূমিকা রাখে। যেমনটা দেখা যায় কোন কোন শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের ও অন্য শিক্ষার্থীদের আচরণে। একজন শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষা বা তার পড়ালেখার বিষয়ে আশানুরূপ ফলাফল না করতে পারে তাহলে সে চায় যাতে শিক্ষকরা তার দুর্বলতার জায়গাগুলো আর দশজন শিক্ষার্থীর মতই তাকেও বুঝিয়ে দিক। কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষকদের তা না করে বরং বলতে দেখা যায় (ভুক্তভোগী ছাত্রীর ভাষায়) ''*...কেতো কিছু বলাই যাবে না, বললেই তো আবার.....*"। অন্যদিকে, এই 'রোগ/অসুস্থতা' র কিছুদিন পর অন্য আরেকজন ছাত্রী স্কুলে যেতে শুরু করলে পর তার সহপাঠীদের কেউ কেউ তাকে বলে, "*আজকে অসুস্থ হইলে পর তুমার সেবা কে করব?* " আমাদের মাঠকর্ম চলাকালীন সময়ে আমরা এমনটিও পর্যবেক্ষণ করেছি যে, অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিল এমন মেয়েরা স্কুলে আসলে পর তাদেরকে শিক্ষক এবং প্রিন্সিপাল স্কুলে আসার জন্য তিরস্কার করেছেন এই বলে, "*তোমাদের না আপাতত স্কুলে আসতে নিষেধ করছি...তোমাদেরকে দেখলে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে...তারপরও তোমরা আজকে কেন স্কুলে আসছ?*"

আক্রান্তের বিভিন্ন আচরণ যা তার দৃষ্টিতে পূর্বের মতই 'স্বাভাবিক' তা এখন অনেক ক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকের কাছে 'রোগ/অসুস্থতা'র ফলাফল/প্রভাব [আক্রান্ত ব্যক্তি ভুলতে চাইলেও মনে করিয়ে দেওয়া হয় যা 'রোগী'র উপর বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি করে, আবার অসুস্থতায় অক্রান্ত হয়] বলে বিবেচিত হয়। যেমন- 'রোগ/অসুস্থতা'য় আক্রান্ত হবার পর বর্তমানে সুস্থ থাকলেও একজন মেয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তার যে কোন নিস্পৃহতা/ মন খারাপ লাগা / বিরক্তি প্রকাশের সাথে সাথে তার মা বিষয়টিকে 'রোগ/অসুস্থতা' র ফল হিসাবে বর্ণনা করেন (মেয়েটির ভাষায় মায়ের মন্তব্য- ''*তুই তো আগে এরকম ছিলি না এই অসুখের পর এমনটা হইছিস*'')। ভুক্তভোগীর মতে, এ ধরনের আচরণ 'রোগ/অসুস্থতা' পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিকে তার অসুস্থতা প্রসঙ্গে কোনভাবেই ভুলবার অবকাশ দেয়না এবং পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়বার সম্ভাবনাকে একভাবে বাড়িয়ে দেয়। সচেতনভাবে অভিভাবকরা হয়তো তা চান না কিন্তু এরূপ আচরণের ফলে অভিভাবকের অজান্তেই ব্যক্তির মনোজগতে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করতে পারে যা আমাদের সাথে এই মেয়েটির আলাপচারিতায় উঠে আসে।

৬. উপসংহার

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্টতই আমাদের সামনে এসেছে তা হল যে, সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'গণ হিস্টেরিয়া'র ঘটনাটি অনুধাবন করতে গেলে এর বহুমাত্রিকতাকে বোঝা অপরিহার্য যেখানে হিস্টেরিয়া/ 'গণ হিস্টেরিয়া'কে কেন্দ্র করে কিভাবে জ্ঞান নির্মিত হচ্ছে এবং সেগুলো আবার কিভাবে সমাজে প্রচলিত লিঙ্গীয়-মতাদর্শিক জ্ঞানকে উৎপাদন ও পুনুরুৎপাদন করছে সেটিকে বোঝার পাশাপাশি যে সামাজিক পরিসরে নারী/আক্রান্ত নারী বসবাস করে তার স্বরূপটাকে বোঝা জরুরি। এই সামাজিক পরিসর কেবল স্থানিক কোন বিষয় নয় বরং তার চেহারাটা অনেক বেশি বৈশ্বিক যেখানে নারীর যাপিত প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক লিঙ্গীয় মতাদর্শ, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক বাজার ব্যবস্থা, আধুনিক মিডিয়ার বৈশ্বিক ক্ষমতাচর্চার মত বিষয়গুলোর সংমিশ্রণ ঘটে থাকে যেখানে নারীকে জীবন প্রণালীর মধ্যে জটিল সমন্বয় (complex articulation of mode of life) করে চলতে হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করা ও লেখার ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতার জন্য আমি আমার সহযোগী গবেষক আলোকা তালুকদারের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পর্যালোচকের কাছে যিনি প্রবন্ধটি পাঠ করে তার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সেটিকে এ পর্যায়ে এনে দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

টীকা:

[১]মাঠ-গবেষণায় আমরা 'আক্রান্ত' শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক, পরিবারের লোকজনদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ; 'অ-আক্রান্ত' শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে নানা সময়ে বিস্তারিত আলোচনা; 'আক্রান্ত' ও অ-আক্রান্ত ছাত্র, ছাত্রীদের নিয়ে (বয়ঃসন্ধি'র)আলাদা-আলাদাভাবে দলগত আলোচনা করেছি; এছাড়াও স্থানীয় চিকিৎসক হিসেবে মসজিদের হুজুর, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক, স্থানীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ নানা স্তরের মানুষজনের সঙ্গে আলাপচারিতাও ছিল তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

[২]২০০৭ সালে বাংলাদেশের অনেকগুলো স্থানে 'গণ হিস্টেরিয়া'র ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা বলেন যে, কোন একজন কে দেখে,শুনে অপরাপর মানুষজন এই অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। যাকে দেখে,শুনে এই অসুস্থতার বিস্তার ঘটে তাকে 'ইনডেক্স কেস' বলে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের অনেকগুলো স্থানে 'গণ হিস্টেরিয়া'র ছড়িয়ে পড়বার ক্ষেত্রে আদিয়াবাদকে নিয়ে মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রচারকে দায়ী করেন। সেক্ষেত্রে, সারা বাংলাদেশের জন্য 'ইনডেক্স কেস' ছিল আদিয়াবাদ।

তথ্যপঞ্জী

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী মানস ২০০৩, নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৫।

Abu-Lughod, Lila 1991. The Romance and Resistance: Tracing Transformation of Power through Bedouin Women In *American Ethnologist*. Pp. 41-55.

Bartholomew, Robert.E 1990. Ethnocentricity and the Social Construction of 'Mass Hysteria' In *Culture, Medicine and Psychiatry* (14). Pp. 455-494.

Bartholomew, Robert.E 2005. "Mystery Illness" at Melbournen Airport: Toxic Poisoning or Mass Hysteria? In *The Medical journal of Australia*. Vol.183 (11-12). Pp 564-6.

Bartholomew and Goode 2000. Hysterias: Highlights from the Past Millennium. In *Skeptical Inquirer*.

Bartholomew, Robert E & Wessely, Simon 2000. Protean Nature of Mass Sociogenic Illness: From Possessed Nuns to Chemical and Biological Terrorism Fears In *The British Journal of Psychiatry* 180. Pp 300-306.

Blanchet, Therese 1984. *Meanings and Rituals in Birth in Rural Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Bordo, Susan 2003. The Body and the Reproduction of Femininity In *Unbearable weight*. Los Angeles: University of California Press. Pp. 165-176

Bordo, Susan & Jagger, Alison M 1989. *Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstruction of Being and Knowing*. Rutgers University Press. Pp. 13-16

Foucault, Michel 1977. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel 1978. *The History of Sexuality. Vol.1: An Introduction*. New York: Random House.

Gardner, Paula 1992. New Women At-Risk: Pathologizig Eating, Bleeding, Birth, Distress & Aging In *http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/1/2/8/6/pages112862/p112862-1.php*

Gutting, Garry ed. 1994. *The Cambridge Companion to Foucault*. Cambridge: Cambridge University Press.

Herzlich in Auge Marc & Herzlich Claudine 1995. Modern Medicine & the Quest for Meaning: Illness as a Social Signifier In *The Meaning of Illness*. Luxembourg: Harwood Academic Publishers GmbH.

ICDDR,B 2008. Outbreak of Mass Sociogenic Illness in Students in Secondary School in Bangladesh during July-August 2007 In *Health & Science Bulletin 6(2).*

Jones, Timothy. F 2000. Mass Psychogenic Illness: Role of the Individual. In *American Family Physicians*, Vol. 62(12) Pp.2649.

Mullings, Leith 1984. *Therapy, Ideology and Social Change: Mental Healing in Urban Ghana*. Berkeley: University of California Press.

Naher, Ainoon 2008. *Gender, Religion and Development in Rural Bangladesh: An Examination of Fundamentalist Backlash against Women's participation in NGO Activities in the Early 1990s*. Germany: VDM Verlag Muller.

Ong, Aihwa 1987. *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia*. Albany: State University of Newyork Press.

Petersen, Alan and Bunton, Robin 1997 *Foucault: Health and Medicine*. London: Routledge.

Porter, Roy 1993. The Body and The Mind, The Doctor and The Patient : Negotiating Hysteria. In Showalter, Elaine & et al eds. *Hysteria Beyond Freud*. Los Angeles: University of California Press. Pp. 225- 282.

Rabinow, Paul ed. 1984. *Foucault Reader*. New York: Penguin Books.

Rousseau, G.S. 1993. "A Strange Pathology" Hysteria in the Early Modern World, 1500-1800. In Showalter, Elaine & et al eds. *Hysteria Beyond Freud*. Los Angeles: University of California Press. Pp. 91-222.

Scott, James C 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Showalter, Elaine & et al eds. 1993. *Hysteria Beyond Freud*. Los Angeles: University of California Press.

Showalter, Elaine 1993. Hysteria, Feminism and Gender. In *Hysteria Beyond Freud*. Los Angeles: University of California Press. Pp. 286-335.

Verma, Satish K & Srivastava, DK 2003. A Study on Mass Hysteria (monkey men?) Victims in East Delhi. *Indian Journal of Medical Sciences* Vol.57 (8). Pp : 355-60

Wessely, Simon 2000. Responding to Mass Psychogenic Illness. In *NEJM* 342:129-130.

- http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_hysteria
- http://19thcentury.wordpress.com/2007/12/05/female-hysteria/
- http://wapedia.mobi/en/Female hysteria